আড়ালে ঝড়

বিনতা রায়চৌধুরী

রাগিণী রাস্তা দিয়ে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে। বেলা এগারোটা বেজে গিয়েছে।

কিন্তু ও মেট্রো স্টেশনের দিকে গেল না। কারণ ও ঠিক করে ফেলেছে আজ অফিস যাবে না। তবু দিকশূন্যভাবে হেঁটে চলেছে। মনের মধ্যে একটা রাগ গজরাচ্ছে। কী ভাবে লোকটাকে শায়েস্তা করা যায়! জীবনে অনেক রকম হার্ডল ও পেরিয়েছে কিন্তু কখনও অতিলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার ইচ্ছে জাগেনি। আজ মনে হচ্ছে ও যদি সুপারউওম্যান হত তাহলে বেশ হত।

লোকটার নাম সংক্ষেপে একেডি, পুরো নাম অশ্বিনীকুমার দেব। মানুষের মতো দেখতে হলেও সে মনুষ্যপদবাচ্য নয় মোটেই। লোকটা সুযোগসন্ধানী, কুটিল এবং কামুক।

আজ যে রাগিণী অফিস না গিয়ে রাস্তায় হেঁটে বেড়াচ্ছে তার একমাত্র কারণ ওই একেডি। অবস্থাটিকে রাগিণী বহুবার বহু রকমে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেছে কিন্তু পারেনি। তাই আজ সুপারউওম্যান হয়ে লোকটাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা চল্লিশতলা বাড়ির ছাদ থেকে ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করছে। কিংবা যদি মেট্রো লাইনে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া যায়! অথবা সপাসপ চাবুকের বাড়ি।

রাগিণীর ইন্টারভিউ খুব ভাল হয়েছিল। তার স্বতঃস্ফূর্ত বাক্‌ভঙ্গি, বুদ্ধির পালিশ এবং ভব্যতা, বোর্ডের সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। পরে ও জেনেছিল যে একেডি ওকে অতটা ফেভার না করলেও চাকরিটা ও-ই পেত।

চাকরি হওয়ার পর অন্য সকলের মতো রাগিণীরও মনে হয়েছিল একেডি একজন ভগবানতুল্য মানুষ। তবে কি না কোনও-কোনও ভগবানের থেকে একটু দূরে থাকাই ভাল। তাই রাগিণী তার বস একেডি'র থেকে একটু দূরে থাকাই পছন্দ করত।

এক মাস পর্যন্ত রাগিণীর কোনও অসুবিধা হয়নি। চাকরিটা বেশ এনজয় করছিল ও। কিন্তু ধীরে-ধীরে একেডি তার উপর একটু বিশেষ রকম নজর দিতে শুরু করল। যদিও সে বলত, ''আমি তোমার উপর খুব বেশিই ডিপেন্ড করতে শুরু করেছি। এত ভাল তোমার কাজ। থ্যাঙ্ক ইউ রাগিণী, তুমি আসার পর আমার দুশ্চিন্তা অনেক কমে গিয়েছে।''

প্রথমে ভালই লাগত রাগিণীর। কমপ্লিমেন্টস কার না ভাল লাগে? এক্সট্রা কাজও করে দিত হাসিমুখে। তাঁর সময়ের পরেও কাজ দিলে কখনও না বলেনি। কিন্তু ক্রমশ রাগিণী বুঝতে পারল এক্সট্রা কাজ ও সময় কোনওটাই সুপথে এগোচ্ছে না।

একেডি ধীরে-ধীরে এগোচ্ছিল। একটু অসুবিধা বোধ করলেও রাগিণী মানিয়ে নিচ্ছিল। কাজের সুবিধার ছলে একেডি বিকেলের পর রাগিণীর সিট অ্যারেঞ্জমেন্ট নিজের ঘরে করিয়ে নিচ্ছিল। একসঙ্গে সান্ধ্য-কফিপানেও না বলেনি। এমনকী, কাজের সময়ের থেকে কফি-পানে সময় বেশি চলে যাচ্ছে দেখে শুধু হালকা অস্বস্তি দেখিয়েই চুপ করেছিল রাগিণী। আস্তে-আস্তে একেডি তার মুখোশ খুলে বেরিয়ে আসছিল। রাগিণী তখন আপত্তি করেছিল। একেডি দু'চারদিন চুপ করে রইল। তারপর আবার।

রাগিণী বলল, ''আমি আপনার বিরুদ্ধে সেক্সসুয়াল হ্যারাসমেন্টের অভিযোগ আনতে পারি, জানেন?''

''প্রমাণ করতে পারবে না।''

''যদি পারি? সাক্ষী জোগাড় হয়ে যাবে।''

''জয়েন করার পর এত তাড়াতাড়ি কারও ইনক্রিমেন্ট হয়? আমিও তোমার নামে খারাপ অভিযোগ করব।''

"সে কী! ইনক্রিমেন্ট তো আমি চাইনি। আপনা থেকেই হয়েছে।"
"আমি অনেক কিছু প্রমাণ করে দেব। অফিসে আর ঢুকতে পারবে না।"
"এটা অন্যায়।"
"অন্যায়? শক্তিমানেরা যা করে সবই ন্যায়! তার চেয়ে যা বলি শোনো, তোমাকে আমি বঞ্চিত করব না..."
পরের কথাগুলো আর শুনতে ইচ্ছে হয়নি রাগিণীর। আপাতত একটা ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে। একেডি'র একটা শাস্তির ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত ও আর অফিস যাবে না।

এখন কোথায় যাবে রাগিণী? বাড়ি ফিরে যাবে না। কারও কোনও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে চায় না এই মুহূর্তে। ওর শর্বরীর কথা মনে পড়ল। অনেক দিন দেখা হয়নি। সেই ওর বিয়ের সময়েই শেষ দেখা। শর্বরীর সেলফোনের নম্বর এই মুহূর্তে রাগিণীর কাছে নেই। শ্বশুরবাড়ির ল্যান্ড নাম্বারও জানে না। ও কপাল ঠুকে শর্বরীর বাপের বাড়ির নম্বর ডায়াল করল। সঙ্গে-সঙ্গেই বেজে উঠল ফোনটা। রাগিণী মনে-মনে বলল, 'যাক বাবা, লাইনটা এখনও জ্যান্ত আছে।' একটু সময় বাজার পরই ওদিক থেকে কেউ একজন 'হ্যালো' বলতেই রাগিণী চাপা চিৎকার করে উঠল আনন্দে, "শর্বরী?"
"হ্যাঁ। রাগিণী?"

অটো থেকে নেমে ভাড়া মিটিয়ে রাগিণী ঢুকে পড়ল শর্বরীর বাড়িতে। শর্বরীর মধ্যবিত্ত বাড়ির ছবিটি একেবারেই এক আছে। মাসিমাও আগের মতো স্নেহময় কণ্ঠে এসে কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। সেই চেনা সোফা আর ডিভানে বসে আগের মতো দুই বন্ধু মুখোমুখি।
রাগিণী ওকে জিজ্ঞাসা করল, "তোর আজ স্কুল নেই?"
"আছে কিন্তু ছুটি নিয়েছি। এক বছরের মধ্যে তিনবার ছুটি। সে যাক, তোর কথা বল, চাকরি করিস তো। এই ভরদুপুরে অফিস না করে টো-টো কোম্পানি কেন?"
রাগিণী ওর সমস্যাটা খুলে বলল।
শর্বরী বলল, "হুঁ, এটা একটা ঘোরতর সমস্যা। প্রথমেই বাধা দিসনি কেন?"
"আরে দিয়েছি, কিন্তু সে বুঝলে তো! আচ্ছা ধর, হঠাৎ যদি তোর সামনে কেউ পড়ে যায়, ধরে ফেলবি তো তাকে? আর সে যদি তোকে আঁকড়ে ধরে দোষও দিতে পারবি না। এভাবেই শুরু হয়েছিল। তারপর দেখলি, তোর সামনে কেউ ঘন-ঘন পড়ে যাচ্ছে আর তোকে আঁকড়ে ধরছে।"
"তারপর?"
"তারপর, পড়ে যাওয়া ছাড়াই আঁকড়ে ধরতে চাইছে এবং..."
হা-হা করে হেসে উঠল শর্বরী, "আমি হলে দু'দিনেই টাইট করে দিতাম।"
"ওরকম বলা সোজা। যাই হোক, তোর কেসটা বল। এত ছুটি কেন?"
"আর কী বলব? কপিলকে ভালবেসেই বিয়ে করেছিলাম। বিয়ের পরও কোনও অসুবিধা ছিল না। ভালই কাটছিল। আমার বাড়িতে কাজ করত যে মহিলাটি, সে হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিল একদিন। কাজের লোক না থাকলে আমার স্কুল যাওয়া ভারী মুশকিল। কিন্তু তার চেয়েও একটা ব্যাপার, আমি বুঝলামই না, তার কী অসুবিধে হচ্ছিল। চলে যাওয়ার সময় তাকে বার-বার জিজ্ঞাসা করায় সে বলে উঠল একবার, "তোমার স্বামীকে একটু সামলে রেখো বউদি।"
আমি তো অবাক। সে আবার কী কথা? আমি পরে কপিলকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তুমি কি মতিয়াকে কিছু বলেছ?"
"কে মতিয়া?"
"আরে মতিয়া, যে আমাদের কাজ করত। প্রায় বিনা নোটিশে চলে গেল কাজ ছেড়ে। আমার স্কুল যাওয়া যে মাথায় উঠবে এবার।"
"আমি তো তোমার মতিয়াকে চিনিই না।"
এত অবধি বলে শর্বরী চুপ করে রইল।
রাগিণী বলল, "আসল সমস্যাটা কী বল না। মতিয়া, না কপিল?"
"সেটা বলা আমার পক্ষে এত লজ্জাজনক। যাই হোক শুরু যখন করেছি সবটাই বলব। মতিয়ার পর আর একটা মেয়েকে রাখলাম। নাম নির্মলা, বেশ সুশ্রী দেখতে, দেখেই পছন্দ হয়ে গেল। তার অনেক দুঃখ, সে প্রথমেই বলে নিল, "আমার জীবনে অনেক রকম 'ফ্যাকটো' আছে।" ফ্যাকটো মানে ফ্যাক্ট, বুঝতে একটু সময় নিলাম। নির্মলার আগে আর একবার নাকি বিয়ে হয়েছিল। প্রথম স্বামী রেলে কাটা পড়ে মারা যায়। তারপর এই লোকটার সঙ্গে ভালবাসা এবং বিয়ে। নির্মলার যুক্তিটা বেশ অন্যরকম, এই বয়সে তো স্বামী ছাড়া থাকা যায় না! কেন থাকা যায় না, সে আর আমি জিজ্ঞাসা করিনি। নির্মলা বেশ ভালই কাজ করছিল। কপিলের ফাই-ফরমাশও বেশ ভালই খাটে। আমাকে অত নজর দিতে হয় না।
একদিন হঠাৎ নির্মলা কাজে এল না। আমি গজগজ করতে লাগলাম ঘরে। কপিলকে বললাম, "দেখলে নির্মলার কাণ্ড! হঠাৎ কোথায় উধাও হল?"
কপিল বলল, "কে নির্মলা? আমি বললাম, নির্মলা, আমাদের কাজের মেয়ে। সব সময় ঘরের মধ্যে ঘুরছে, চেনো না?" ও ঠোঁট ওলটালো, "কে জানে, অত কে খেয়াল রাখে?"
তিনদিন পর নির্মলা কাজে এল। আমি বললাম, "এভাবে উধাও হওয়ার মানে?" সে দাঁত বার করে হাসল, "দাদাকে বলে গিয়েছি তো। আমাকে তো আলাদা 'বকশিশও' দেলেন। তারকেশ্বর গিয়েছিলাম।"
"আমি খুব বড় একটা ধাক্কা খেলাম। নির্মলা তারকেশ্বর গিয়েছিল বলে না, কপিল ওকে ছুটি দিয়েছে, টাকা দিয়েছে, অথচ আমার কাছে বলল, নামই শোনেনি! হঠাৎ মতিয়ার কথা মনে পড়ে গেল। কাজের মেয়ে মানেই তো খারাপ নয়। ও কিন্তু নিজে থেকেই কাজ ছেড়ে দিয়েছিল, যাওয়ার সময় একটা সাবধান বাক্যও শুনিয়ে গিয়েছিল। ওর বেলাতেও কপিল বলেছিল, কে মতিয়া?
আমার কেন জানি না খুব রাগ হয়ে গেল, নির্মলাকে ছাড়িয়ে দিলাম। আমার বাড়িটা ওর জীবনের অন্যতম 'ফ্যাকটো' হোক, চাইলাম না।"
রাগিণী শরীর টান করে ডিভানে শুয়েছিল। হাসি পেলেও হাসল না। বন্ধুর দুর্গতিতে হাসা চলে না, নোনতা হাসি হলেও না। এর মধ্যেই মাসিমা ঢুকলেন, লুচি আর আলুভাজা নিয়ে, ঠিক আগের মতো। মধ্যবিত্ত মানুষগুলি অতিথি সৎকারে এখনও দিলদরিয়া এবং ঘরোয়া।
বড়লোকদের মতো কফি আর কাজুবাদামের স্টেটাস সিম্বল হয়ে ওঠেনি! রাগিণীর খিদে পেয়েছিল। খেতে-খেতেই বলল, "পুরোটা শেষ কর।"
শর্বরী বলল, "তিনদিনের ছুটি নিয়ে বহু কষ্টে একটা অল্পবয়সি মেয়ে পেলাম। নাম ঝুমঝুমি। ওকে কাজ-টাজ বুঝিয়ে, মোটামুটি তৈরি করে দিলাম। ফ্রক ছাড়িয়ে সালোয়ার কামিজ পরালাম। এক মাসের মধ্যেই সে উদ্ভিন্নযৌবনা হয়ে উঠল। ভাবলাম, শাসনে রাখব। একদিন দেখি, কপিল যখন যে ঘরে থাকে তখন সে ঘরে গিয়ে ঝুমঝুমি ঘর মোছে আর ক্লিভেজ দেখায়। শুধু তাই নয়, এ মেয়ের শরীর থেকে যৌনজ্যোতি ছড়ায়। কপিল তো কোন ছাড়! অনেক পুরুষই...।"
রাগিণী শর্বরীর কথার মধ্যেই বলে উঠল, "তার মানে কপিলমুনিরও ধ্যান ভঙ্গ হয়ে যাবে। তুই শাশুড়িকে একটু বলতে পারতিস।"
"বলেছিলাম, উনি বললেন, পুরুষমানুষকে একটু নজরে রাখতে হয়। বোঝ, সুরাহা

করবে কোথায়, তা না, আমাকেই জ্ঞান দিয়ে দিল।"

বাধ্য হয়ে আমাকে একটু নজরে রাখতে হল। ঝুমঝুমিকে লক্ষ করে দেখলাম, সে কপিলের সঙ্গে কথা বলার সময় গা দোলায়, মুখ মচকিয়ে হাসে। ঘন-ঘন চা করে খাওয়ায়। আরও নজর করে একদিন দেখলাম, কপিল ওকে টাকা দিচ্ছে। কিসের টাকা? কপিল ভিজে বেড়ালের মতো বলল, "আবদার করছিল, জামা কিনবে।" ঝুমঝুমি সামনে থেকে সরে গেল পরে। আমি কপিলকে বললাম, টাকাটার কথা পরে জিজ্ঞাসা করলে নিশ্চয়ই বলতে, কে ঝুমঝুমি?"

"সেটা আছে না গিয়েছে?" রাগিণীকে একটু রাগী দেখাল এবার।

"রাখব কী? সে তো আমার উপর দিয়ে যায়। যখন ধমক দিলাম পরে, "আমার থেকে জামা কেনার টাকা না চেয়ে দাদার থেকে চাইলি কেন?" সে শরীরে হিল্লোল তুলে হেসে বলল, "ও তুমি বুঝবে না। চিন্তা কর, আস্পর্ধা দেখ একবার। সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড় ধরে বিদায় করে দিলাম।"

"তারপর? আবার ছুটি? ডিভোর্স করে ফেল। এইরকম লোকের সঙ্গে...।"

"নারে, বিয়ে করলে বুঝতিস, ফট করে ডিভোর্স করা যায় না। অনেক ব্যাপার। একটার সঙ্গে আর একটা জড়িয়ে থাকে। তাছাড়া ধর বাড়িতে যদি কাউকে ভূতে ধরে, তাহলে ওঝা ডাকবি? নাকি তাকে বাড়ি থেকেই তাড়িয়ে দিবি?"

"হুঁ, কথাটার যুক্তি আছে। আর?"

"আর, ভালবাসা-টাসার কথা বাদ দিলে কপিল ছেলেটি স্বামী হিসাবে খারাপ নয়। সুদর্শন, ভাল চাকরি করে, স্ত্রী স্বাধীনতা বিরোধী নয়, এমনকী কৃপণও নয়। একটা কাজের মেয়েকে গুরুত্ব দিয়ে সাজানো সংসারটা ভেঙে দেব? সাজাতেও তো পরিশ্রম কম হয়নি।"

"হুঁ, এ কথাটারও যুক্তি আছে। আমি তোর জায়গায় থাকলে দু'দিনেই সোজা করে দিতাম। তা তুই তো জুডো শিখেছিলিস একসময়!"

"তাতে কি? ছুঁকছুঁক করা স্বভাবের বরকে সিধে পথে আনতে জুজুৎসু প্যাঁচ দেব? তারপর কি আর সংসার করা যাবে?"

রাগিণী উঠে বসল টান-টান হয়ে। তাঁর মাথায় যেন একটা আইডিয়া এসেছে। শর্বরী ওর হাব-ভাব দেখে বলল, "কী হল, হঠাৎ উত্তেজিত কেন?"

"শর্বরী, একটা কাজ করবি? তুই একেডি'কে একটু শিক্ষা দিয়ে আয়, আর আমি কপিলমুনিকে একটু ধ্যানস্থ করে দিয়ে আসি। দু'জনে একে অন্যের সমস্যা নিরসনের দায়িত্ব নিতে পারি না?"

"হ্যাঁ, তুই পারবি জানি। তোর খুব বুদ্ধি, তা ছাড়া কপিলের উপর তোর কোনও ইমোশন নেই তাই কাজটা সোজা হবে। কিন্তু আমি অফিশিয়াল কাজ সামলাতে পারব?"

"কেন পারবি না। আমরা দু'জনেই বি.কম. অনার্স গ্র্যাজুয়েট, একসঙ্গে কম্পিউটার ট্রেনিং নিয়েছিলাম। বেশ পারবি।"

দু'জনেই শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল।

২

শর্বরীকে দেখতে এমনিতেই বেশ সুন্দর। তারপর আবার চশমা ছেড়ে কনট্যাক্ট লেন্স নিয়েছে। পুরো ফর্মাল পোশাক পরে হাতে একটা ফাইল নিয়ে সোজা রাগিণীর অফিসে ঢুকে একেডি'র চেম্বারে হাজির। একেডি ওর আপাদমস্তক একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। জিভে জল এনে দেওয়ার মতো চেহারা মেয়েটির। কিন্তু মুখে প্রকাশ করল না, গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "কী চাই?"

"এখানে একটা পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্টের পোস্ট খালি আছে শুনলাম। আমি সি-ভি নিয়ে এসেছি। যদি একটু দ্যাখেন।"

"সি-ভি'তে যা আছে মুখে বলুন, একটু শুনি।"

গড়গড় করে বলে গেল শর্বরী। একটু বাড়িয়েই বলল। বিশেষ করে ওর এক্সপিরিয়েন্সের খতিয়ানটা, তারপর করুণ মুখ করে বলল, "টেমপোরারি হলেও চান্সটা যদি দয়া করে দেন। বাড়িতে অসুস্থ স্বামী, বুড়ি শাশুড়ি!"

একেডি গম্ভীর মুখে বলল, "আমার যে পি-এ, সে একটু ছুটিতে আছে, সেই জায়গায় আমি টেমপোরারি তোমাকে নিতে পারি।"

"ও থ্যাঙ্ক ইউ স্যর। কবে থেকে আসব?"

"শুভস্য শীঘ্রম। কাল থেকেই আসুন।"

"থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।"

শর্বরী বাড়িতে এসে কপিলকে ফোন করল, "স্কুলের চাকরিটা ছুটি নিয়ে-নিয়ে খোওয়ালাম। একটা অফিসে জয়েন করেছি। পি-এ'র চাকরি। মাইনে বেশ ভাল! তোমরা মা-ছেলেতে সুখে থাকো। আমি আর এখন যাচ্ছি না।"

"অফিসে পি-এ'র চাকরি? আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না?"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করে মতিয়া, নির্মলা আর ঝুমঝুমির সঙ্গে আশনাই শুরু করেছিলে?"

"ছিঃ-ছিঃ ও কী কথা শর্বরী! ও সব তোমার মনগড়া কাহিনি। আমি তোমাকে কত...।"

"কী সর্বনাশ! পরের কথাটা বলে ফেলবে নাকি? রাখছি আমি।' কপিলের কাঁচা মিথ্যেটা যদি মনে সত্যি হয়ে ধরা দিয়ে যায়! তাই আগেই শর্বরী ফোন ছেড়ে প্রাণ বাঁচাল।

পরদিন থেকে শর্বরী অফিস শুরু করল। একেডি তাকে যা কাজ দেয়, তাছাড়াও সে যেচে-যেচে অনেক কাজ করে দিচ্ছিল। নিজেই এই ফাইল, সেই ফাইল বার করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখছিল। আপটুডেট করে ফেলছিল পুরনো কাজগুলো।

একেডি খুশি হয়ে বলল একদিন, "ম্যাডাম, আপনার কাজ দেখে আমি খুশি। আপনি যদি সব কাজেই এমন খুশি

করতে পারেন, তাহলে যে ছুটিতে গিয়েছে তাকে ছুটি করে দিয়ে আপনাকেই পার্মানেন্ট করে দেব।''
''সো কাইন্ড অফ ইউ স্যর।'' শর্বরী খুশির ভান করল।
কয়েক দিন পর ঠিক একই কায়দায় একেডি চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েই পড়ে যাওয়ার ভান করল। শর্বরী তৈরিই ছিল, খপ করে একেডি'র কোটের কলার চেপে ধরে দাঁড় করিয়ে দিল। একেডি দারুণ অপ্রস্তুত। কোটটা ঠিক করতে-করতে বলে উঠল, ''আর একটু হলেই পড়ে যাচ্ছিলাম।''
''আপনাকে বাঁচাতে আপনাকে ধরতেই হল। কিছু মনে করেননি তো?''
''না-না, ঠিক আছে।'' দাঁড়িয়েই জবাব দিল একেডি।
''বসুন না স্যর। দাঁড়িয়ে কেন?''
একেডি বসতে যেতেই ওর চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিল শর্বরী। একেডি সেটা দেখতে পেল না এবং বসতে যেতেই একেবারে ধপাস। হা-হা করে উঠল শর্বরী। এবার একেডি তাড়াতাড়ি নিজেই উঠে পড়ল। লজ্জাও পেয়ে গেছে সে। এরকম একটা মেয়ের সামনে সে কি না, সত্যিই...।
''কোই দেখেঙ্গে তো কহেঙ্গে গিরা হুয়া ইনসান। সরি, স্যর, মাঝে-মাঝে হিন্দি বলে ফেলি। আমার খুব খারাপ লাগছে স্যর।''
''ঠিক আছে, ঠিক আছে, এটা বাইরে গিয়ে বলার দরকার নেই।'' মুখে এ কথাটা বলে ফেললেও একেডি'র কানে 'গিরা হুয়া ইনসান' বাজতে লাগল। আর খুব গম্ভীর হয়ে গেল সে।

রাগিণী পরদিনই সকালে কপিলদের বাড়িতে চলে এল। অনেক দিন পর শাড়ি পড়েছে সে, তাও সুতির ছাপা শাড়ি। একটু অসুবিধেই হচ্ছে। তবু যাই হোক। কপিলই প্রথমে তার মুখোমুখি হল।
''কী চাই?''
''এই বাড়ির বউদি কাজের লোকের জন্য সেন্টারে ফোন করেছিলেন। আমার নাম রাণু। রাখবেন নাকি? যদি দরকার না থাকে বলে দেবেন, চলে যাব।''
রাখবে না মানে? কপিলের সকাল থেকে ভাল এককাপ চা জোটেনি। দোকান থেকে কিনে আনা চা দিয়ে চালিয়েছে। মা এই বয়সে রান্নাঘরে যেতে হয়েছে বলে দুঃখ করছিল। কপিল মা'কে কথা দিয়েছে কাল থেকে 'হোম-ডেলিভারি'র ব্যবস্থা করবে। মা একটু অবাক হয়েছেন, ''সে কী, বউমা কত বার 'হোম ডেলিভারি' ফুড প্যাকেট আনতে চেয়েছে, তুই তো আপত্তি করতিস।''
''সে তোমার বউমা থাকলে আপত্তি টিকত, সে যে করেই হোক রেঁধে-বেড়ে দিত! কিন্তু সে না থাকলে তো আনতেই হবে।'' সোজা হিসেব কপিলের। রাণুর দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল কপিল, ''বউদি যখন ফোন করেছে নিশ্চয়ই রাখা হবে।''
টাকাপয়সা ইত্যাদির কথা হয়ে গেল। কাল থেকেই রাণু আসবে।
যাওয়ার আগে রাণু বলল, ''এ বাড়িতে কোনও মেয়েমানুষ নেই? মেয়ে কেউ না থাকলে সে বাড়িতে আমি কাজ করি না। বউদি কোথায়?''
''তোমার বউদি বাপেরবাড়ি গিয়েছে। দাঁড়াও, মা'কে ডেকে আনছি।''
কপিলের মা এসে দাঁড়াল। রাগিণীর একটু মজা করতে ইচ্ছে হল, বলে উঠল, ''আপনি এর মা? দেখতে তো দিদির মতো লাগে।''
বুড়ি চনমন করে উঠল। বাঁকা পিঠ সোজা করে ফেলল, যুবতী আছে সে এখনও, দেখানোর জন্য। সামনের ছ'টা আর পেছনের এগারোটা, সাকুল্যে সতেরোটা দাঁত পুরোই বেরিয়ে এল হাসির দোলায়,
''তুমি বেশ মেয়ে রাণু। স্বামী কী করে?''
''আমি কোনও স্বামী-আসামির ধার ধারি না। খাটি-খাই, নগদ চাই।''
''আ-হা, মনে বড় দুঃখ আছে মনে হচ্ছে।''
''দুঃখ মানে? বেজায় দুঃখ। কপিলমুনি জব্দের কাজ নেওয়া কি চাট্টিখানি কথা?''
''মুনি'টা জোরে আর 'কপিল'টা আস্তে উচ্চারণ করল রাণু।
বুড়ি বলে উঠল, ''কিসের মুনি?''
রাণু সঙ্গে-সঙ্গে গম্ভীর, ''দিদি, আমার দু'টো শর্ত আছে কাজের।''
''কিসের শর্ত আবার?''
''আমি রাতে থাকব না। আট'টায় ছুটি দিয়ে দিতে হবে। আর আমি ডাইনিং টেবিলেই খাব। নীচে বসলে আমি উঠতে পারি না। ঘর মোছার জন্য দাদাকে বলবেন লম্বা হ্যান্ডেলওয়ালা ঝাড়ন এনে দিতে।''
''হুঁ। রাতে থাকবে না, সেটা ভালই। বউমা নেই, কে তোমাকে চৌকি দেবে? কিন্তু বাকি দু'টো? ছেলেকে একবার জিজ্ঞাসা করি।''
কপিল বলল, ''রাজি হয়ে যাও মা। শর্বরীও বলেছে, ঘর মোছার জন্য বড় হ্যান্ডেলওয়ালা ব্রাশ আনতে! এনে দেব আমি।''

রাণু পরদিন বেশ সকাল-সকাল এল। এত ভাল চা কপিল জীবনে খায়নি। কপিলের মা-ও খুশি। তবে মেয়েটা তাঁর সঙ্গে ডাইনিং টেবিলে বসে চা গেল বিস্কুট ডুবিয়ে। সহ্য করতে হল। কিন্তু মেয়েটা ঠিক আর পাঁচটা কাজের মেয়ের মতো নয়। একবার যেন মনে হল ইংরেজি কাগজ পড়ছিল। সে নিশ্চয়ই তার চোখের ভুল।
রাগিণী তার হ্যান্ডিকাম ক্যামেরাটা এনে শর্বরীর ঘরে বইয়ের ফাঁকে এমন করে সেট করল যে, কেউ দেখতে পাবে না, ঘরে সে কাজে এলে কপিলও পিছনে-পিছনে আসে। ও সোজা বলে দিল, ''যে ঘরে আমি যতক্ষণ কাজ করব, সেই ঘরে আপনি ঢুকবেন না। আমার অসুবিধা হয়।''
''দরকার হলেও নয়?''
''দরকার হলে নিশ্চয়ই ঢুকবেন। আমাকে ডাকতেও পারেন। কিন্তু তা ছাড়া না।''

রাত সাড়ে দশটায় দুই সখীর কথা হল ফোনে। দু'দিকের খবর পেল দু'জনেই। শর্বরীর কাজে রাগিণী খুব খুশি। ও বলল, ''ভেঙে দিলি না কেন? কোমরটা?''
''ধীরে বন্ধু ধীরে। মুনি-ঋষির বাড়ির খবর কী?'' রাগিণী ও বাড়িতে রাণুর কর্মকাণ্ডটা জানাল। শর্বরীও খুশি হল, ''বেশ করেছিস। তবে ওই ভদ্রমহিলাকে আমি মন থেকেই 'মা' ডেকেছিলাম কিন্তু এত শীতল ব্যবহার পেয়েছি যে বলার না। তুই ওকে অত গাছে ওঠালি? দিদি ডাকছিস?''
''আগে তো ওঠাই, নামানোটা তো আমার হাতে!''
''দ্যাখ রাগিণী, আমাদের বাড়িতে তুই কত খাটছিস, আমার বাজে লাগছে।''
''তুই-ও তো অফিসে আমার খাটনিটা খেটে দিচ্ছিস, বাজে লাগার কী আছে? আর তোর বাড়িতে কী এমন কাজ? একটু-আধটু রান্না করতে আমার ভালই লাগে। নিজেও তো খাই। তোর বর আর শাশুড়িও খুশি হয়ে খায়।''
''তোর অমন দারুণ রান্না, আমিই শুধু মিস করছি। এই, কপিল ভাল বাজার-টাজার করে? ও তো মাছ খেতে খুব ভালবাসে।''
''হ্যাঁ-হ্যাঁ, তা করে। তবে তোরা বড় মাছ খেতে ভালবাসিস, না? ওই রুই কাতলা ভেটকি, চিংড়ি? কিন্তু ছোট মাছের পুষ্টি কিন্তু অনেক।''
''ও-বাবা, তুই আবার এসব জানলি কোথা থেকে?''
''আমি একবার একটা নিউট্রেশন কোর্স করেছিলাম, তখন শিখেছি।''হ্যাঁ রে। এই যেমন ধর ফলুই মাছে কাতলার থেকে ক্যালশিয়াম বেশি, ফসফরাসও। ভেটকির থেকেও। এমনকী এর প্রোটিন লেভেল

রুই, কাতলা বা ভেটকির চেয়ে বেশি অথচ ফ্যাট খুব কম। আর একটা খুব কম দামি মাছের কথা বলছি, একে গরিবের গলদা চিংড়ি বলে। দারুণ উপকারী। বলতো কী?''

''সেটা কী মাছ রে, সত্যি জানি না।'

'লোটে মাছ। এতে ভিটামিন এ আর ডি যা থাকে তাতে লিভার, হাড়, চোখ, ত্বক, খুব ভাল রাখে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। ফ্যাট কম কিন্তু প্রোটিন, ক্যালশিয়াম, ফসফরাস বেশ ভাল পরিমাণে রয়েছে।'

''তুই যতই লোটে মাছের গুণকীর্তন কর আমি খেতে পারব না। কি বিচ্ছিরি দেখতে।''

''ওই তো তোদের দোষ। সুন্দরী পাবদাকে কত দাম দিয়ে কিনে নিয়ে যাবে সকলেই কিন্তু পাশেই তার খুড়তুতো ভাই পারশেকে পাত্তা দেবে না। অথচ পারশের গুণ পাবদার চেয়ে বেশি।''

''ঠিক আছে। মনে রাখিস, ওদের যত যত্ন করে রেঁধে খাওয়াচ্ছিস, আমারও সেইরকম পাওনা হচ্ছে। কিন্তু তোর আসল কাজটা একটু ডিটেলস-এ বল না।''

''কোনও ডিটেলস নেই। আমি যে ঘরে যখন থাকব, তখন সেই ঘরে কপিলকে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছি।''

''কিন্তু রাণী, প্রথম থেকেই তুই অত স্ট্রিক্ট হলে কপিল তোর কাছে তো খাপই খুলবে না?''

''খুলবে-খুলবে। এই নিয়ে টেনশন করিস না।''

''বেশ'' 'গুডনাইট' জানিয়ে দুই বন্ধুই শুতে চলে গেল।

এভাবেই রোজের খবর রোজ দুই বন্ধু শেয়ার করছে।

শর্বরী বলে ''ওই অফিস টাইমের হুটোপাটি অনেক দিন অভ্যেস নেই তাই একটু অসুবিধে হচ্ছে।'' কোনও দিন বলে, ''আমি যে এত স্মার্ট আছি এখনও, ভিতরে -ভিতরে সেটা বেশ যাচাই হয়ে গেল।'' আবার এক দিন বলল, ''কাজটা মন্দ লাগছে না। স্কুল ছেড়ে দিয়ে অফিসে কাজ নিয়ে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে। পাব না? বল! আর শোন, তোদের অ্যাডভ্যাটাইজিংয়ের অসিত কর্মকার কিন্তু একটু চুকলিবাজ আছে, সাবধান।''

রাগিণী একদিন বলল, ''সব ভাল, ঠিক আছে, কিন্তু তোদের বাড়ি ঘর ঝাট্ মোছ কিন্তু ভীষণ বোরিং। কেমন যেন লাগছে।''

শর্বরী খুব দুঃখ প্রকাশ করল, ''সত্যি, ভেরি সরি। ওটা আমারও বাজে লাগছে। যেভাবে হোক ওটা কাটা না। কিন্তু মুনির কী খবর? বশ হল? আমাকে তো ফোনে প্রায়ই ফিরে যাওয়ার প্রার্থনা জানাচ্ছে।''

''আর একটু অপেক্ষা কর। মোটামুটি এগোচ্ছি।''

শর্বরী সব গল্প শুনিয়ে দিচ্ছে কারণ ওর অ্যাসাইনমেন্টটায় বস জব্দ করার দায়িত্ব। কিন্তু রাগিণী এসেছে শর্বরীর বরকে শিক্ষা দিতে, এখানকার গল্প ডিটেলস-এ বলা মুশকিল। এই যেমন সেদিন রাগিণী নিজের শাড়ি পরায় বিরক্ত হয়ে কপিলের মা'কে সোজা বলে বসল, ''আমি কি সালোয়ার কামিজ পরে আসতে পারি? কিংবা জিন্স আর টপ।'' কাছে কপিলও দাঁড়িয়ে ছিল, সে সানন্দে অনুমতি দিয়ে দিল, কিন্তু মা বলল, ''সালোয়ার কামিজ পরতে পারো, কিন্তু জিন্স-ফিন্স নয়।''

একটু পরে রাগিণী কপিলের ঘরে গিয়ে বলল, ''সালোয়ার কামিজ কিনব, পাঁচশো টাকা দেবেন? মাইনে থেকে পরে কেটে নেবেন।''

''নিশ্চয়ই দেব। কাছে এসো না। অত দূরে-দূরে কেন?''

একটু এগিয়ে এল রাগিণী। ওর হাতে পাঁচশো টাকা দিয়ে কপিল বলল, ''এই টাকা মাইনে থেকে নাও কাটতে পারি যদি আমার একটু সেবা-যত্ন করো।''

''কিরকম সেবা যত্ন?'' রাগিণী মনে-মনে প্রচুর হাসছে। আজ কপিলমুনির ধ্যানমগ্ন হওয়ার দিন। এমন ধ্যানে বসিয়ে দেব, জীবনে আর সেই ধ্যান ভাঙবে না।

''রাণু, তোমার কাজ আমার খুব পছন্দ। এত ভাল রাঁধতে বুঝি দ্রৌপদীও পারে না। চা-তো নয় যেন অমৃত।''

''কী যে বলেন!'' রাণু আর একটু কাছে এল। মনে-মনে ভাবল ক্যামেরাটা অ্যাঙ্গেল পাচ্ছে তো?

''হ্যাঁ রাণু। দেখো, তোমার বউদি বাপের বাড়ি গিয়ে বসে আছে। আমার যে কী কষ্ট!'' কপিল করুণ গলায় বলল,

''দ্যাখো, তুমি আমাকে একটা অয়েল ম্যাসাজ দিতে পারো না? মাঝে-মাঝে একটু মাথাটা টিপে দেবে, দেবে তো রাণু?'' এই বলে কপিল রাণুকে জাপটে ধরতে গেল। রাণু একটা লাফ মারল আর 'হু-লা-হু-লা-লা' বলে চেঁচাতে লাগল! কপিল থতমত খেয়ে বলল, ''অমন লাফাচ্ছ কেন আর চেঁচাচ্ছ কেন? আশ্চর্য!''

''আমার যে ভীষণ কাতুকুতু। কেউ আমার গায়ে হাত দিলে— হু-লা-লা হু-লা-লা।''

রাগিণী ছটফট করেই যাচ্ছে।

কপিল কাকুতি করল, ''চুপ করো।'' মনে-মনে ভাবল, সব কাজের মেয়েই এতে ইমপ্রেসড হয়, উপরি রোজগারের সুযোগ পায়। দু-একটা মেয়ে অবশ্য সতীপনা দেখায়, কিন্তু রাণুটা কোন দলের বোঝা যাচ্ছে না। মা কিছু শোনেনি। বাঁচোয়া।

কপিল সামনে থেকে সরে গেল।

রাগিণী পরে ভাবল, ও শর্বরীকে বলে দেবে, তোর কাজ করে দিয়েছি কিন্তু কীভাবে কী করেছি শুনতে চাইবি না। শর্বরীর বুদ্ধি থাকলে বুঝে নেবে। না বুঝলেও বুঝতে হবে।

সন্ধেবেলা রাগিণী বেরনোর সময় কপিল বাড়ি থাকে না। রাগিণী সহজেই ক্যামেরাটা বার করে বাড়ি নিয়ে যায়। আট'টার অনেক আগেই চলে যায়। সকালে এসে খুব সাবধানে ক্যামেরাটা যথাযথ জায়গায় ফিট করে দেয়।

শর্বরীকে কাল একেডি একটা পার্টিতে সঙ্গ দেওয়ার জন্য ইনভাইট করেছিল, শর্বরী 'না' বলে দিয়েছে, ''আমি নাচতে জানি না। মদ্যপানে অভ্যস্ত নই। আপনার সঙ্গে পার্টিতে গেলে, আপনার পার্টি খারাপই হবে। আপনার স্ত্রী'কে নিয়ে যান না।''

''ওরে বাবা, কল্যাণী? সে লক্ষ্মীর পাঁচালি পড়ে, তুলসীতলায় সাঁঝবাতি দেয়, দুর্দান্ত মখমলি মুর্গি রাঁধে। সে পার্টিতে যাবে না, যোগ্যও না।''

''যেটা সে করে, সেটা তো আপনি পছন্দও করেন, করেন না?''

''হ্যাঁ, তা করি। কল্যাণীর সঙ্গে ওটা বেশ মানিয়ে গিয়েছে।''

মনে-মনে শর্বরী দাঁতে দাঁত ঘষল। বদমাশ, বাড়িতে বউয়ের পাঁচালি শুনবে আর অফিসে পি-এ'র বাহু ধরে নাচবে আর শ্যাম্পেন ওড়াবে। দ্যাখ না, তোর কী করি!

একেডি খোস মেজাজে সারাদিন কাটাল। শর্বরীর মনে হল, একটু বেশিই খুশি আছে অশ্বিনীকুমার দেব। বিকেলের দিকে একবার ডাকল ওকে, ''শর্বরী, তুমি আজ ছুটির পরে বাড়ি যেও না। আমার ঘরে একটা আলাদা টেবিল আছে, ওখানে একটা কম্পুটারও আছে। ওখানে এসে বোসো, একটু কাজ আছে।''

''ওকে স্যর।''

এক কথায় খুশি হয়ে রাজি হয়ে গেল শর্বরী, সেটা দেখে একেডি'র ভাল লাগল। বলল, ''তোমার একটা স্পেশ্যাল ইনক্রিমেন্ট করিয়ে দেব।''

''ওভাবে না দিয়ে হাতে-হাতে একষ্টা টাকাটা দিয়ে দিলে ভাল হয়।''

একেডি'র ভুরু দু'টো একসঙ্গে নেচে উঠল, ''রিয়েলি! তাহলে তো চমৎকার হয়। আজই তোমাকে এক হাজার টাকা ইনক্রিমেন্ট আগাম দিয়ে দেব।''

বিকেল সাড়ে পাঁচটা।
শর্বরী ওর ব্যাগটা নিয়ে একেডি'র চেম্বারে চলে এসেছে। সাইড টেবিলে বসে কম্প্যুটার অন করল। পাশে একটা ফাইল, একটা ডি ভি ডি। কাজ দিয়েই রেখেছে বস। যা কাজ দিয়েছে ঘণ্টা দুয়েকের আগে শেষ হবে না।
"কফি খাবে তো? সঙ্গে চিঙ্গ পকোড়া বলি?" একেডি স্মিত হেসে আতিথ্য জানাল।
"হোয়াই নট চিকেন? আই প্রেফার চিকেন।"
"ভেজ হলে সুবিধে হয়। বিশেষ করে অফিসে, আমার নিজের চেম্বারে তো!"
"আপনি ভেজ? আপনাকে দেখলে তো মাংসাশী মনে হয়।"
"রিয়েলি?"
"রিয়েলি।"
একটু পরে পকোড়া খেতে-খেতে শর্বরী ভাবল, এই চাকরিটা বেশ ভালই লাগছে। অ্যাটলিস্ট কোনও একঘেয়েমি নেই। একেডি'কে পকেটে পুরে সে এই চাকরিটা দিব্যি চালিয়ে যেতে পারে। তাহলে রাগিণীর সঙ্গে চুক্তিভঙ্গের অপবাদ কুড়োতে হবে। ও তো আর কপিলকে টাইট করতে আমাদের বাড়িতে আজীবন রান্না করবে না! দেখা যাক, আজ একটা কিছু নিশ্চয়ই ঘটবে।
একেডি'র বিশাল ঘরের মধ্যে পিছনে একটা ডিভান রাখা আছে। সেদিকে দেখিয়ে শর্বরী জিজ্ঞাস করল, "এটা এখানে কেন?"
"ওটা বিশ্রামের জন্য। ইচ্ছে হলে তুমিও একটু রেস্ট করে নিতে পারো।"
শর্বরী মাউসে ক্লিক করতে-করতে বলল, "ইচ্ছে হলে।" বলে একটা চোখ টিপল। এটুকু ইশারাতেই একেডি'র মুখের মধ্যে পকোড়া রসালো হয়ে উঠল। রাগিণী রায়ের মতো একটা বাজে পি-এ'র বদলে শর্বরী এসেছে ভেবে তার পুলকে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।
একটু পরে, তখন রাত নেমে এসেছে সদ্য, অফিসের বেশিরভাগ লোকই গন। একেডি পকেট থেকে দু'টো পাঁচশো টাকার নোট বার করে শর্বরীকে দেখিয়ে টেবিলে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখল, "তোমার ইনক্রিমেন্টের টাকাটা, আগাম।"
"হুঁ।"
"শর্বরী, সামনের শনিবার যে পার্টিটা আছে, আমার সঙ্গে যাবে তো?"
"বললাম তো নাচ জানি না, ওয়াইন খাই না।"
"ওয়াইনের গ্লাসে ঠোঁট ঠেকিয়ে রাখলেই হবে। আর নাচ তো আমি তোমাকে তিনদিনেই শিখিয়ে নেব।"
"তাই নাকি?"
একেডি উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। ডিভানের সামনে ফাঁকা জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়াল এবং শর্বরীর দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকল, "চলে এসো শর্বরী।"
"কী ব্যাপার? আমি কাজ করছি।"
"এটাও কাজ। এসো, তোমাকে নাচের কয়েকটা স্টেপ শিখিয়ে দিই।"
উঠে দাঁড়াল শর্বরী। কাল রাতেই ভুলে যাওয়া জুডোর মারপ্যাঁচগুলো প্র্যাক্টিস করেছে। এত তাড়াতাড়ি কাজে লাগাবে, নাকি একেডি'কে একটু খেলাবে ভাবল শর্বরী। তারপর অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন উঠে গেল, "আমি আনাড়ি, আপনারই কষ্ট হবে অশ্বিনী।"
"হুঁ। ভেরি স্মার্ট। নাম ধরে বললে, আমার ভালই লাগল। কিন্তু অফিসে সকলের সামনে নয়।"
শর্বরী উঠে সামনে গেল।
একেডি হাত বাড়িয়েই আছে।
হাত বাড়াল শর্বরীও, আর পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই একেডি ভূতলশায়ী হল। চমকে গেছিল একেডি,

অতর্কিতে পড়ে গিয়ে তার লেগেছে। উঠে পড়ল আর মুখ খিঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ''তুমি আমার সঙ্গে প্যাঁচ কষলে নাকি?''
''আমি তো বলেছিই আপনার অসুবিধে হবে।''
একেডি'র মুখটা লাল হয়ে গেছে। রেগে গিয়েছে ভীষণ। চোখ পাকিয়ে বলল, ''তোমাকে দেখাচ্ছি মজা।''
শর্বরী ডিভানে গিয়ে বসল! একেডি প্রায় ওর দিকে তেড়ে এল, ভাবখানা এই যে ওকে নিয়ে সোজা ডিভানেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। একেডি'র নিম্নাঙ্গ লক্ষ করে শর্বরী সর্বশক্তি দিয়ে লাথিটা ছুড়ল। একেবারে ট্রেন্ড কিক। একচুল এদিক ওদিক হল না। মাটিতে পড়ে একেডি কাতরাতে লাগল। ওর মনে হল পুরুষাঙ্গটা ফেটে গিয়েছে। শর্বরী উঠে গিয়ে পাঁচশো টাকার নোট দু'টো পকেটে পুরল, তারপর বলল, ''লোকজন ডাকি তাহলে?''
কাতরাতে-কাতরাতে মুখ বিকৃত করে একেডি বলল, ''কেন? কী বলবে সকলকে?''
''আপনার দু'পায়ের মাঝখানে আমি লাথি মেরেছি সেটা বলব না, কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্স তো ডাকতে হবে মনে হচ্ছে।''
''ইউ বিচ!''
''আর একটা ডোজ় দেব? একটা কথা যদি বলেছ আর।'' চোখ পাকিয়ে তর্জন করল শর্বরী।
দরজা খুলে চেঁচিয়ে বলল, ''এই তোমরা শিগগির এসো, একটা অ্যাম্বুল্যান্স ডাকতে হবে। স্যর পড়ে গিয়েছেন জোর।''
প্রথমেই ছুটে এল করিম। একেডি'র খাস বেয়ারা। তার পিছনে-পিছনে আরও কয়েকজন। সবাই হতভম্ব। করিম অ্যাম্বুল্যান্স ডাকতে যাচ্ছিল, একেডি ধমক দিল, ''করিম, আমার ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বল। অ্যাম্বুল্যান্স ডাকতে হবে না।'' অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, ''তোমরা একটু সাহায্য করো, লিফট অবধি নিয়ে চলো আগে। তারপর গাড়িতে।''
অন্যদের সঙ্গে শর্বরীও সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল, আর গলায় যথেষ্ট উদ্বেগ, সহানুভূতি মিশিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ''আপনার কোথায় লেগেছে স্যর?''
একেডি শর্বরীর দিকে ভয়ঙ্কর চোখে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।
পরদিন আর অফিস গেল না শর্বরী। অনেক বেলা অবধি ঘুমিয়ে, রিল্যাক্স করল, তারপর স্কুলে গেল। কবে জয়েন করবে জানাতে।

কপিল বসে ছিল ঘরে। আজ রবিবার। তিনবার চা দিয়েছে সকাল থেকে রাণু। আঃ মেয়েটা খাসা। শর্বরীকে ও মিস করছে না তা নয়। কাল রাতে ওর জন্য খুব মন খারাপ লাগছিল। আসলে বউ বউ-ই, আর এই সব রাণুরা-রাণুই। তবু এই মেয়েটা চলে গেলে ওর রান্নার জন্য কষ্ট হবে। মা-ও বলছিল। তাছাড়া মেয়েটা ঠিক কাজের মেয়ের মতো নয়। বেশ শিক্ষিত, বুদ্ধিমতী। মোটামুটি লেখাপড়াও জানে।
রাণু একটা তেলের বাটি নিয়ে ঢুকল, ''মাসাজ নেবেন বলেছিলেন।''
''তুমি সত্যিই মাসাজ দেবে?'' লাফিয়ে উঠল কপিল।
রাণু দরজাটা ভেজিয়ে দিল। একটা শতরঞ্চি বিছিয়ে বলল, ''শুয়ে পড়ুন এখানে।'
পট-পট করে শার্টের বোতাম খুলে ফেলল কপিল, চকচকে চোখে রাণুকে জিজ্ঞাসা করল, ''শুধু উপরটা খুলব, নাকি নীচের পা-জামাটাও?''
''পরে, আগে উপরটাই হোক।''
কপিলের বুকের উপর এক খাবলা তেল থাবড়ে রাণু বলল, ''আপনার তো প্রশস্ত বক্ষ, আমি কি হাত দিয়ে পারব? যদি পা দিয়ে মাসাজটা দিই?''
''পা দিয়ে মাসাজ হয়?''
''হয় না? গঙ্গার ঘাটে গিয়ে দেখুন, ভীষণ-ভীষণ স্বাস্থ্যবানের শরীরে অল্পবয়সি ছেলেগুলো কী দারুণ মাসাজ করে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে।''
''বেশ তো, তোমার যা ভাল লাগে তাই করো।''
কপিলের কথা শেষ হল না, রাণু উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল ওর বুকের উপর এক পা দিয়ে, কপিল হাত বাড়িয়ে রাণুর পায়ের গোছে ছোঁয়া দিতেই বসে পড়ল রাণু, ''বলেছি না ছোঁবেন না, খুব কাতুকুতু আমার।'' মনে-মনে শর্বরীর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিল রাগিণী, তারপর কপিলের বুকে হাঁটু রেখে ঝুঁকল। এত কাছে রাণু, ওর ফর্সা বুকের খাঁজ, কপিল টালমাটাল, ''আহা! যেন পাকা দুটি আতা। একটু ছুঁই?''
লাফিয়ে উঠে পড়ল রাণু, ''কী করছেন, কী করছেন? হুঁ-হুঁ-হুঁ বাবারে বাবা!''
''আরে, আমি তো তোমাকে... এদিকে এসো রাণু... আচ্ছা ছোঁব না, শুধু একটু দেখি। তুমি আমাকে তেল মাখাবে আর আমি শুধু দেখব।''
কপিলের দিকে তাকিয়ে জিভ ভেংচাল রাণু, ছোঁ মেরে তেলের বাটি তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
কপিল কিছু বুঝলই না।

পরদিন রাণু ঘরে ঢুকল একটা জিন্সের ওপর বাটিকের একটা শর্ট পাঞ্জাবি পরে। একটু মস্তান গোছের দেখাচ্ছিল ওকে। হাতে একটা ডিভিডি।
কপিল কোলের ওপর ল্যাপটপ নিয়ে নিজের কাজ করছিল, রোজ যেমন করে। সোজা সেখানে এসে দাঁড়াল রাগিণী। কপিল হাসল। রাণুকে কাছে দেখলেই কপিলের আশা জাগে। পিছলে-পিছলে যাচ্ছে বটে মেয়েটা কিন্তু শেষ অবধি ধরা দেবেই। তাড়া কিসের? শর্বরীও তো নেই বাড়িতে, ধীরে-সুস্থে হবে। ''কিছু বলবে রাণুমণি?''
''এই ডিভিডি-টা পেলাম, একটু চালিয়ে দেখে দিন তো, ঠিক কী আছে এটায়।''
ল্যাপটপে ডিভিডি'টা চাপিয়ে একটু অপেক্ষা করতে হল, তারপরই ভেসে উঠল একের পর এক ছবি। সেই কপিলের রাণুকে পাঁচশ টাকা দেওয়া থেকে আরম্ভ করে কাল পর্যন্ত। যেখানে রাণু বসে আছে আর কপিল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলছে— 'যেন পাকা দুটি আতা, একটু ছুঁই?'
কপিল ঝপ করে বন্ধ করে দিল ল্যাপটপ, ''এর মানে কী?''
''এর মানে এই ডিভিডি'র চারটে কপি করা হয়েছে। যদি আপনি আর কোনও কাজের মেয়ের পিছনে লাগেন, এই ডিভিডি'র একটা কপি যাবে শর্বরীর

একেডি হাত বাড়িয়েই আছে। হাত বাড়াল শর্বরীও, পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই একেডি ভূতলশায়ী।

কাছে, একটা আপনার অফিসে, একটা আমার কাছে, আর একটা আপনার পাড়ায়।''

''তোমার সাহস দেখে তাজ্জব হচ্ছি। ছবিগুলো কীভাবে তুললে ভাবতে আশ্চর্য লাগছে। আবার সুবিধা মতো এডিট করে নিয়েছ। আগে থেকেই প্ল্যান করেছিলে বুঝি? তোমাকে যদি এখন শাস্তি দিই বাড়িতে আটকে রেখে? কী করবে? সর্বনাশ করে দিতে পারি তোমার।''

''আমার? আমি একটা মিস কল করব আর আমার স্বামী আপনার বাড়ির সামনে স্ক্রিন টাঙিয়ে এই ডিভিডি'টা দেখাতে শুরু করবে। সুতরাং ও সব না করে কপিলমুনি সেজে ঋষির মতো ধ্যান করুন আর জপ করুন— ভাল হব, সৎ হব, ভাল হব— সৎ হব। আমি কিন্তু কাল থেকে আর আসব না। আমার মাইনে দিতে হবে না আপনাকে। সেই পাঁচশো টাকা দিয়ে আপনার বুড়ি মা'কে জর্দা কিনে দিয়েছি। চললাম।''

রাগিণী বেরোনর সময় শর্বরীর শাশুড়ির ঘরে ঢুকল একবার, ''এই যে মাসিমা, নিজের বউমাকে একটু মেয়ে বলে ভাবতে শিখুন। ছেলেকে শাসন করবেন, আমি আর আসছি না। চললাম।''

''তুমি আমাকে মাসিমা বললে কেন? রোজের মতো দিদি বললে না?''

''কপিলবাবুই বলল—আমার বুড়ি মা'কে মাসিমা বলবে। আমি চললাম।''

রাগিণী মনে-মনে কুল কুল করে হাসল, লাগিয়ে দিলাম মা-ছেলের মধ্যে। যত দিন চলে তত দিনই শর্বরীর শান্তি।

কপিলের মা ভুরু কুঁচকে কপিলের ওপর বাণ-বর্ষণ করতে লাগল, ''ও ব্যাটাই নষ্টের গোড়া। ওর জ্বালাতেই এত ভাল মেয়েটা বিগড়ে গিয়ে লম্বা দিচ্ছে। হবেই তো, বাপটাই কি কম ছিল?''

একেডি'র কাঁধের হাড় সরে গিয়েছে। নার্সিংহোমে ভর্তি। খবরটা অফিসে গিয়ে পেল শর্বরী। সবার মধ্যে পাঁচশো টাকার নোট দু'টো টেবিলে পেপার ওয়েট চাপা দিয়ে রাখল, ''আজ আমার তরফ থেকে তোমাদের ট্রিট দিচ্ছি। কাল থেকে আর আসব না। তোমাদের সেই পুরনো ম্যাডাম রাগিণী রায়ই আসবে।''

অ্যাকাউন্টেন্ট তড়িৎ বলে উঠল, ''আসবে কী? এসে গিয়েছে। এই যে। শর্বরী তাকাল, আরে তাই তো! রাগিণী বসে আছে পাশের চেয়ারে। শর্বরী হেসে হাত বাড়াল। রাগিণী সেই হাত ধরে করমর্দনের ভঙ্গিতে ঝাঁকুনি দিল। অসিত বলল, ''আপনি কেন ট্রিট দিচ্ছেন?''

''তোমার এত ইন্টারেস্ট কেন? একেডি'র কাছে চুকলি করবে? ঠিক আছে, বলে দিও, 'এক গিরা হুয়া ইনসান'-এর হাড় ভাঙার আনন্দে ট্রিট দিচ্ছি।''

৩

রাগিণীর আজ সব দিক থেকে মুড ভাল। অফিসের ঝামেলা মিটে গিয়েছে। একেডি'র যা শিক্ষা হয়েছে তাতে করে আর কখনও রাগিণীকে ডিস্টার্ব করবে মনে হয় না।

দ্বিতীয়ত, অংশুমান বেঙ্গালুরু থেকে ফিরছে। ফোনে অংশু জানিয়েছে, এত দিনে বোধহয় ওদের শেষের কবিতা মার্কা বিরহের দিন শেষ হতে চলেছে। পনেরো দিন কলকাতায় আর পনেরো দিন বেঙ্গালুরুতে থাকার জীবন শেষ হতে চলল এবার। অংশুমান কলকাতাতেই পোস্টেড হয়ে যাচ্ছে। রাগিণীর বিরহের দিন শেষ। এতদিন অংশু ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলত, ''আমাদের বিরহটাকে এনজয় করো রানি, যখন দেখবে প্রতিকূল অবস্থাটা নিয়ন্ত্রণ করা তোমার হাতে নেই, তখন সেই অবস্থা থেকেই যতখানি সম্ভব ফায়দা তুলতে হয়।''

''তুমি বেঙ্গালুরুতে আমার বিহনে কীরকম বিরহ উপভোগ কর গো? অফিসের সুন্দরী-সুন্দরী কোলিগদের মধুর সান্নিধ্য?''

অংশুমান জিভ কেটে বলেছিল, ''আমাদের বিবাহপূর্ব পূর্বরাগের দিব্যি রানি, তুমি ছাড়া আমি আর অন্য কোনও মেয়ের দিকে ফিরেও তাকাই... শেষ কথাটা আর বলতে দেয়নি রাগিণী ওকে। অংশুর ঠোঁট বন্ধ করে দিয়েছিল নিজের ঠোঁট দিয়ে। ও সব কথা শুনতে ওর ভয় করে। বাইরে থেকে দেখলে ওকে বেশ কঠিন আর শক্তপোক্ত লাগে। মনে-মনে ও খুব নরম। বিশেষ করে ওর ভালবাসার ব্যাপারে। অংশুর সঙ্গে কোনও দিন দূরত্ব এসে যেতে পারে, সে কথা ও ভাবতেও ভয় পায়।

অংশুমানের বাড়িতে আর একজন প্রাণী আছে, সে হল কমললতা। অংশুর মা। কমললতা রাগিণীকে খুব ভালবাসেন। মেয়ের মতোই। রাগিণীও নিজের মা ছাড়া হবু শাশুড়িকে অন্য কিছু ভাবে না।

দু'জনের সম্পর্কে মিষ্টত্বের অভাব একফোঁটা নেই। তবে রাগিণী বিয়ের বেশ কিছু দিন আগেই কমললতার মধ্যে একটা অদ্ভুত জটিলতা লক্ষ করেছে। কাউকে বললে সে হয়তো বিশ্বাসই করবে না। তবে নিজের অনুভব তো আর অন্যকে ব্যক্ত করে বোঝানো যায় না!

অংশু যখন কলকাতার বাইরে থাকে তখন কমললতা ইজ ভেরি কেয়ারিং মাদার। রাগিণীকে তখন খুব ভালবাসেন। যত্নও করেন। একটু সময়ের জন্যও মন খারাপ করে থাকতে দেন না। বলে দেন, ''রোজ একবার আসবি।''

রোজ না পারলেও রাগিণী মাঝে-মাঝে গিয়ে কমললতার সঙ্গে দেখা করে আসে। ওকে খুব যত্ন করেন তিনি।

রোজই কিছু না কিছু রেঁধে খাওয়ান। আর রাঁধেনও চমৎকার। ওঁর কাছ থেকে তো বেশ কয়েকটা রান্নার রেসিপি নিয়েছে রাগিণী।

রান্নার হাত রাগিণীরও ভাল তবে কমললতার হাত আরও পাকা।

অংশুমান যখন বাইরে থাকে তখন কমললতা রাগিণীকে খুব যত্ন করে বসান, গল্প করেন, খাওয়ান। কিন্তু আশ্চর্য, অংশু এসে গেলে এই মানুষটাই কী ভীষণ ক্যাঙ্গুয়াল হয়ে যান।

অথচ এর উলটোটাই হওয়া উচিত। অংশুকে দেখিয়ে দেখিয়েই তার সঙ্গে বেশি বেশি ভাল ব্যবহার করা উচিত, তা করেন না।

তখন কেবল অংশু আর অংশু। অংশু কী খেতে ভালবাসে, অংশু আমার রান্না খেয়ে কী প্রশংসা করল, সেদিকে উদগ্রীব দৃষ্টি দিয়ে বসে থাকেন। অন্যান্য সময় রাগিণী কমললতার কোনও কিছুর প্রশংসা করলে খুব খুশি হন। কিন্তু অংশু থাকলে রাগিণীর প্রশংসার কোনও পাত্তাই দেন না।

এক দিন তো বলেই ফেলল রাগিণী, ''আমি যখন অত প্রশংসা করলাম তখন তুমি কিছু বললে না। যেই অংশু প্রশংসা করল খুশিতে উপচে পড়লে, কেন?''

কমললতা গম্ভীর হয়ে বললেন, ''ও তুমি বুঝবে না।''

আশ্চর্য! অংশুমানের জীবনে নিজস্ব স্পেস ক্রাইসিসে ভোগেন নাকি মানুষটা?

কপিল আজ বার-বার ফোন করছে শর্বরীকে, ''তুমি কখন বাড়ি আসবে? আর রাগ করে থেকো না প্লিজ।''

''কেন আমাকে ছাড়া তোমার কী অসুবিধে হচ্ছে? ভালই তো আছ।''

''একটুও ভাল নেই আমি। তোমাকে ছাড়া বাড়িটা অমাবস্যা হয়ে আছে। এই সব সংসার-টংসার কি আমি একা সামলাতে পারি?''

''কেন, তোমাদের বাড়িতে তো কাজের লোক আছে এখন। দারুণ ভাল কাজের লোক।''

''না-না, কেউ নেই। সেন্টার থেকে একজন এসেছিল, সে চলে গিয়েছে।''

''ও তাই বুঝি আমার কথা মনে

পড়েছে?''
এই বলে ফোন ছেড়ে দিয়েছে শর্বরী। তারপর আর ধরেইনি ফোন।
কপিলের মা'ও ফোন করলেন একবার। বাড়ি ফিরে আসতে অনুরোধ করলেন। নিজের ছেলের উপরেই রাগ দেখালেন। এমনকী অনেক কপাল করে সে শর্বরীর মতো বউ পেয়েছে, সে কথাও স্বীকার করে ফেললেন।
শর্বরী শাশুড়ির সঙ্গে ভাল ব্যবহার করল। করবে না কেন, তার সঙ্গে তো শর্বরীর কোনও বিরোধ নেই। তবে এখনই বাড়ি ফিরে যাবে, সে কথায় রাজি হল না। আবার কখনও যাব না, সে কথাও বলল না।
শেষ পর্যন্ত কপিলের অষ্টম ফোনে একটু চিঁড়ে ভিজল। কপিল বলে দিল, সে আজই জোর করে শর্বরীকে বাড়ি নিয়ে আসবে। কোনও কথাই শুনবে না। শর্বরী কষ্ট পাবে এমন কাজ আর সে জীবনে কোনও দিন করবে না। তখন শুধু দু'টো শব্দে শর্বরী রাজি হল— ''ঠিক আছে।''
সত্যি কথা বলতে কি নিজের সংসারে ফিরে যাওয়ার একটা ইচ্ছে তার মধ্যেও অবিরত কাজ করে যাচ্ছে কয়েক দিন ধরে।

কপিলকে সারদা খুব যত্ন করলেন। শর্বরী তো আর মা'কে বলতে পারছে না যে অত যত্নের দরকার নেই ওই মর্কটকে। কপিলের জামাই আদর দেখে ওর যেমন গা রি-রি করছে তেমনই আবার এত দিন পর বাড়ি ফিরতে পেরে খুশিও হচ্ছে। কপিল বাড়ি এসে নিজের ঘরে বউয়ের কাছ ঘেঁষে বসল।
''আমি কি তোমায় ভালবাসি না শর্বরী?'' শর্বরী একটু সরে বসল। ঘরটা গোছাতে হবে। রাগিণীর কর্মযজ্ঞের ফিডব্যাকটাও নিতে হবে এই বাড়ির বড় গিন্নিমার কাছ থেকে। কীভাবে শায়েস্তা করেছে কপিলকে, রাগিণী সেটা কিছুতেই ভাঙল না। বহুবার জিজ্ঞাসা করেছে শর্বরী,
''তোর সঙ্গে কপিল কোনও অসভ্যতা করেছে? মতিয়া কিংবা ঝুমঝুমির সঙ্গে ও ঠিক কী করেছে জানি না তো। তোর কাছ থেকে জানতে পারি।''
'নারে বাবা, সেরকম কিছু করেনি। তোর কপিল অত খারাপ লোক নয়। ওই একটু ইয়ে আর কি। তবে বললাম তো, ধ্যানে বসিয়ে দিয়েছি, তুই ফিরলে তবেই ধ্যান ভাঙবে। অন্য মেয়ে, বিশেষ করে কাজের মেয়েদের দিকে আর ফিরেও তাকাবে না।''
''কী করে কাজটা করলি বলবি তো।''
''বারে! তুই বলেছিলিস, বাড়ির কোনও মানুষকে ভূতে ধরলে ওঝা ডাকতে হয়, মানুষটাকে তো আর মেরে ফেলা যায় না।''
''হ্যাঁ, বলেছিলাম।''
''ওঝা এসে ভূত ছাড়ানোর পর, সেই ভূত তাড়ানো মন্ত্রটাকে বাড়ির লোকদের কানে-কানে বলে দিয়ে যায়?''
''না তা অবশ্য যায় না।'' শর্বরী স্বীকার করল। রাগিণীকে দিয়ে যে আর কিছু বলানো যাবে না, সেটাও বুঝল। থাক, সব সত্যি না জানাই ভাল। ও কপিলকে তো ত্যাগ করতে পারবে না আর রাগিণীর সঙ্গেও বন্ধুত্বটা অটুট থাকুক সেটাই ও চায়।

রাত হয়েছে। কপিল শর্বরীর কাছে-কাছে ঘুরছে। একবার শর্বরীকে কাছে টেনে এনে বলল, ''তুমি ভাবছ, কপিল তোমাকে সত্যি সত্যি ভালবাসে না। কী করে বোঝাব আমি তোমাকে এই ক'দিন কী ভাবে মিস করেছি! আমি যে তোমাকে ভালবাসি সে কথা...''
''অত ভালবাসা-ভালবাসা কোরো না তো, আমার অ্যালার্জি বেরোবে।''
শর্বরীর চোপা শুনে কপিল চুপ করে গেল।
''শোনো, মা বললেন, আগের কাজের মেয়েটার নাম ছিল রাণু, সে নাকি সত্যি-সত্যি খুব ভাল ছিল। আর তোমার জন্যই সে চলে গিয়েছে। কেসটা কী?''
কপিল কিছুই না বোঝার মতো মুখ করে তাকিয়ে রইল।
শর্বরী অধৈর্য হয়ে বলে উঠল, ''প্লিজ বলে বোসো না— কে রাণু?''
কপিল এবার খুব সিরিয়াস হয়ে জবাব দিল, ''এই বিষয়ে আমি কোনও আলোচনা করতে চাই না। যদি আমার কোনও ভুল হয়ে থাকে তার জন্য ক্ষমা চাইছি। কান ধরছি, আর কখনও ভুল হবে না, ঠিক আছে?''
''আগে কান ধরো। শুধু কান ধরলে হবে না, নিলডাউন হয়ে কান ধরতে হবে।''
কপিল অগত্যা বন্ধ বেডরুমে বউয়ের আদেশে নিলডাউন হয়ে কান ধরল। ওর দিকে তাকিয়ে মনে-মনে শর্বরী একরকম হেসেই ফেলল, এই মর্কটটাকে কী করে যে এত ভালবাসে ও, কে জানে? ওর ভিতরের হাসিটা ঠোঁট টুঁইয়ে বোধ হয় একটু নেমে এসেছিল। কপিল সেটা দেখে ফেলেই লাফ মারল বিছানায়। শর্বরীকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়তে-পড়তে বলল, 'এ ক'দিন কী ভাবে যে উপোস করে আছি!' শর্বরী মনে- মনে বলল, আমি যেন উপোস করে নেই! মেয়ে বলে কী মানুষ না!'

৪

সন্ধের পর রাগিণী আর শর্বরী গল্প করতে-করতে পাশাপাশি হাঁটছিল। রাগিণী বলল, ''চল পার্কে ঢুকে বাদাম কিনি।'' শর্বরী বলল, ''না ফুচকা খাব। বিয়ের পর আর ফুচকা খাওয়া হয়নি।'' ফুচকা কিংবা বাদাম, কিংবা দু'টোই, ওরা পার্কের দিকে হাঁটতে লাগল।
রাগিণী বলল, ''ফুচকা আমিও ভালবাসি কিন্তু বাদাম কিন্তু খু-ব উপকারী।''
''ওই তোর শুরু হল। বাদামে কত ফ্যাট বলতো?''
''ফ্যাটটাই দেখলি, ওতে কত প্রোটিন আছে জানিস? প্রচুর ভিটামিনও আছে। তাছাড়া বাদামে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে।''
''চিনে বাদামে?''
''সব বাদামে, তাই বলে ছাতা ধরা বাদাম খাসনা কিন্তু! খুব ক্ষতিকর।''
''তাই নাকি?''
''আচ্ছা বল তো, বাদামের রাজা কে?''
''বাদামের রাজা, সে আবার কে?''
''সেটা খেলে বুদ্ধি বাড়ে তাই তাকে সরস্বতীর মাথার ঘিলু বলে।''
''যাঃ, কী সেটা?''
''আখরোট। শক্ত খোলাটা ভাঙলে দেখবি, ঠিক ব্রেনের মতো দেখতে ভেতরটা। আখরোট শুধু ব্রেন ভাল করে না, এর ওমেগো থ্রি ফ্যাটি আসিড কোলন আর ব্রেস্ট ক্যান্সার আটকায়।''
''আমার আর সহ্য হচ্ছে না রাগিণী। তুই যতই বাদামের সুখ্যাতি করিস, আমি আজ ফুচকাই খাব।''
''সে তো আমিও খাব। ফুচকা খেতে কার খারাপ লাগে?''
দু'জনেই খুব খোশমেজাজে আছে। নিজেদের উপর দারুণ আত্মবিশ্বাস এসে গিয়েছে।
সেই দিন যদি রাগিণী অফিস ডুব দিয়ে শর্বরীর বাড়ি না যেত তাহলে ওদের সমস্যার কোনও সমাধানই হত না।
রাগিণী বলল, ''আমাদের ঝটিকা সফর ভালই হয়েছে, বল? কপিল আর অশ্বিনী ঝড়ের মুখে উড়ে গিয়েছে।''
''ঝটিকা বলে ঝটিকা, কুঝটিকা!'' পার্কে ঢুকে ওরা ফুচকাওয়ালার উদ্দেশ্যেই যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখল, বেঞ্চিতে বসে একজন প্রৌঢ়া কাঁদছেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে। শর্বরীই আগে এগিয়ে গেল, ''মাসিমা, আপনি কাঁদছেন কেন? কী হয়েছে?''
''কিছু হয়নি মা।'' ভদ্রমহিলা তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে ফেললেন।
অনেক অনুরোধেও তিনি কিছু বলতে চান

না। শেষকালে মুখ খুললেন। নাম তাঁর সুহাসিনী। কিন্তু ছেলের বউয়ের দাপটে হাসি উড়ে গিয়েছে তাঁর।

"প্রায়দিনই আমাকে বাড়ির বাইরে বের করে দেয়। রাতে ছেলে এসে খুঁজে বাড়ি নিয়ে যায়।"

"বের করে দিলেই আপনি বের হবেন কেন? নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে থাকবেন।"

"শেষকালে কি বউয়ের হাতে মার খাব?"

"আপনার ছেলে কিছু বলতে পারে না? সে কি ভেড়া?"

"ও কথা বোলো না, মলয় খুব ভাল ছেলে। ওর উপর কি অত্যাচার কম করে? কিছু বলতে গেলেই বলবে থানায় যাবে। 'ফোর নাইনটি এইট এ' করবে। কোন দিন না মলয় আত্মহত্যা করে।"

রাগিণী তাকাল শর্বরীর দিকে, "কী রে, একটা ঝটিকা সফর দিবি নাকি?"

"দিতে পারি। কিন্তু এরা আমাদের অজানা। তোর আমার ব্যাপারটা আলাদা ছিল।"

সুহাসিনী তাড়াতাড়ি বললেন, "তোমরা কিছু করতে পারো? বাঁচাও আমাদের।"

"হুঁ, মাসিমা আমি আপনার মাসতুতো বোনঝি, ঠিক আছে?" শর্বরী বলল।

"আর আমি আপনার পিসতুতো ভাইঝি, ঠিক আছে?" রাগিণী বলল।

সুহাসিনী বোকা নন মোটেই, একটু হেসে বললেন, "ঠিক আছে। সত্যিই আমাদের কেউ নেই বলে এই দুরবস্থা। ভাইঝি-বোনঝি পেলে বেঁচে যেতে পারি। তোমরা কি আজই যাবে?"

"না, আমরা কাল যাব। নিজেদের কাজ-কর্ম সামলে তারপর সমাজসেবা।"

"তোমাদের একটা কথা বলে রাখি। আমার বউমার নাম মুকুলিকা, ডাকনাম মুকুল। তার একজন দাপুটে মা আছে, সে রোজই আসে, এখানেই খায়-ঘুমোয়। নাম বাসনা। বাসনার একটু অসুবিধে হলেই মুকুল আমাকে বের করে দেয়।"

শর্বরী বলল, "ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঝড়ের সামনে সব মুকুল ঝরে যাবে, সব বাসনা উড়ে যাবে। তবে আপনাকে আজই এখনই একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ মা?" সুহাসিনী চমকে উঠলেন, "মুকুলের সঙ্গে লড়তে পারব না।"

"ওটা আমাদের দায়িত্ব। আপনি আমাদের সঙ্গে এখন একবার স্থানীয় থানায় যাবেন।" শর্বরী বিষয়টা খোলসা করে দিল।

"থানায়? কখনও যাইনি তো। চিনিও না।" একটু বুঝি ইতস্তত করলেন সুহাসিনী।

"ভয় নেই। আমরা সঙ্গে যাব। সব পুলিশই তো খারাপ নয়। ভাল লোক অথচ পুলিশ, দু'টো একসঙ্গে, এরকম আমি দেখেছি। তাছাড়া সত্যি কথাই বলবেন, চিন্তা নেই।"

শর্বরী আর রাগিণী, দু'জনেই বাড়িতে ফোন করে জানাল, ফিরতে একটু দেরি হবে।

থানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। আর সত্যিই অফিসার খুব ভাল। সুহাসিনীর সব কথা শুনলেন সহানুভূতির সঙ্গে। ডায়েরি নিতে রাজিও হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, "বউমা কখনও মেরেছে আপনাকে? প্রমাণ দেখাতে পারবেন?"

"প্রমাণ? মানে...।" লজ্জায় চুপসে গেলেন সুহাসিনী। অফিসার বললেন, "থাকলে আমার সুবিধা হত।"

"এই যে, দেওয়ালে একদিন মাথা ঠুকে দিয়েছিল, কালশিটে পড়ে গিয়েছে। ছেলে রাতে বরফ-টরফ দিয়েছিল কিন্তু সারেনি।"

সবাই দেখল, সুহাসিনীর কপালের বাঁ দিকে উপরে একটা কালশিটের দাগ।

রাগিণী অফিসারকে বলল, "কাল আমরা ওঁর বাড়ি যাব। থাকব কয়েক দিন। মনে হয় কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু মুকুলিকা যদি ফোর নাইনটি এইট এ করতে আপনার কাছে আসে, তাহলে?"
অফিসার বললেন, "ওনার ডায়েরি তো আমাদের কাছে থাকল। সামলে নেব। তবে আপনাদের সাবধান। মহিলাটি যদি এসে কাটা-ফাটা দেখায় মুশকিল হয়ে যাবে।"
"ধন্যবাদ, মনে রাখব।"
পরদিন রাগিণী আর শর্বরী, সুহাসিনীর বাড়ি এল বেলা দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ। সুহাসিনী তৈরি ছিলেন, সঙ্গে-সঙ্গে দরজা খুলে দিলেন।
শর্বরী চেঁচিয়ে উঠল— "মাসি-ই, কত দিন তোমাকে দেখিনি।" রাগিণী বলল, "পিসি-ই, কত দিন তোমাকে দেখিনি-ই।"
"আয়-আয়, ভিতরে আয়। আমাকে তো তোরা ভুলেই গিয়েছিস।"
রাগিণী আর শর্বরী ভিতরে ঢুকে সোফায় বসল। ভুরু নাচিয়ে শর্বরী জিজ্ঞাসা করল, "কোথায়?"
"ওর ঘরে।" ফিসফিস করে জবাব দিলেন সুহাসিনী।
এর মধ্যেই রাগিণী দেখল, একটা বছর পনেরোর মেয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে বসে বিস্কুট খাচ্ছে।
"এটি কে? এর কথা তো বলোনি মাসি?"
"আমার মেয়ে নন্দিনী। ওর উপরেও যা চলে! ননদ শব্দে নাকি মুকুলের গা জ্বলে। তাই ওকে বিষ, বিষের পুটুলি, রক্ত-বিষ কত কিছু বলে। এই তো স্কুলে যাবে এখন। আর ফিরবে সেই বিকেলে। আগে ছুটি হলে ফেরার উপায় নেই, কড়া নাড়লে নাকি ওর বিশ্রামের ব্যাঘাত হয়।"
"তুমি স্কুলে যাচ্ছ তো, বিস্কুট খাচ্ছ কেন? ভাত খেয়ে যাও।" রাগিণীর কথা শুনে নন্দিনী ভয়ে-ভয়ে বলল, "বউদি বলেছে, ফিরে এসে ভাত খাবি। দু'বার ভাত খেলে ফ্যাট বাড়বে। বিস্কুট খেয়ে স্কুলে চলে যাবি।"
"পিসি, ডাইনিং টেবিলে তো অনেক রান্না চাপা দেওয়া আছে দেখছি। ওকে ভাত বেড়ে দাও। তাকাচ্ছ কী? ভাত বাড়ো।"
সুহাসিনী চোখের জল চেপে মুখে হাসি নিয়ে নন্দিনীর জন্য ভাত বাড়ল, কত দিন পর। নন্দিনী খেতে বসল। শর্বরী উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "মাসি, আমাদের ব্যাগ কোথায় রাখব? তোমার ঘর কোনটা?"
"ওই যে সোজা গিয়ে ডান হাতে কোণের ঘরটা, ওটাই আমার ঘর।"

নন্দিনী স্কুলে চলে গিয়েছে। তখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। রাগিণী বলল, "পিসিমা, তোমার চান হয়ে গিয়েছে? তাহলে চলো খেতে বসে যাই। খিদে পেয়ে গিয়েছে। সে কোথায়, এখনও একবারও দেখলাম না!"
"নিজের ঘরে। চানের আগে অনেকক্ষণ দরজা বন্ধ থাকে। ব্যায়াম করে না ঘুমোয়, জানি না।"
"বেশ, ভাল হয়েছে। আমরা খেয়ে নিই, চলো পিসি, কুইক।"
সুহাসিনী ভয়ে-ভয়ে বলল, "এ বাড়িতে এরকম নিয়ম নেই। আগে মুকুল আর তার মা খাবে, তারপরে আমি খাব। এটাই রীতি।"
"এখন থেকে সব রীতি নিয়ম পালটে যাবে মাসিমা। ভাত বাড়ো। তিনজনের।"
খুশি মনে খেতে-খেতে গল্প করছিল ওরা। মলয়ের কথাই বেশি বলছিলেন সুহাসিনী। "আমার ছেলে খুব ঠান্ডা ধাতের মানুষ। অসভ্যতা, ঝগড়া, একদম সহ্য করতে পারে না। তাছাড়া বড় দোষ, ওই বউকেই খুব ভালবাসে।"
"মুকুলিকা কি প্রথম থেকেই এরকম?"
"হ্যাঁ, প্রায় তাই-ই। ওর মা আরও ইন্ধন দেয়।"
মুকুলিকা যখন ঘর থেকে বের হল তখন ওদের খাওয়া প্রায় শেষ।
দুমদুম করে এসে দাঁড়াল মুকুল, "কী হচ্ছে এখানে? এই যে, তোমরা কারা?"
"ওরা হল আমার...।"
সুহাসিনীর মুখের কথা মুখেই থাকল, মুকুল ধমকে উঠল, "চো-প! তোমাকে জিজ্ঞাসা করেছি?"
শর্বরীর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, উঠে বেসিনে হাত ধুতে-ধুতে বলল, "আমি ওঁর মাসতুতো বোনঝি, আমার মাসি হন উনি।" একই কায়দায় রাগিণী নিজের পরিচয় দিল। তারপর সুহাসিনীর দিকে তাকিয়ে বলল, "চলো তোমার ঘরে যাই পিসি।"
মুকুলিকা তাড়াতাড়ি ডাইনিং টেবিলে এসে দেখল ভাত-টাত প্রায় সবই শেষ। সে ঝলকে উঠল, "এই যে শাশুড়ি, ভাইঝি-বোনঝি নিয়ে গেলা শেষ হয়ে গেল? আমি আর আমার মা কী খাব? ইয়ার্কি হচ্ছে?"
সুহাসিনী ভয়ে সিঁটিয়ে উঠল। রাগিণী বলে উঠল, "আবার রান্না করো। না হলে বিস্কুট খেয়ে থাকো। ফ্যাট কমে যাবে।"
"ও, সেই বিষ-কুটিটাও বোধহয় ভাত গিলে স্কুলে গিয়েছে?'
"এখন থেকে ও রোজই ভাত খেয়ে স্কুলে যাবে। চলো তো পিসিমা, এখানে দাঁড়িয়ে পাগলের বকবকানি শুনতে হবে না।"
ওরা সুহাসিনীকে নিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।
একটু পরে বাসনা নাম্নী স্থূলকায়া এক ভদ্রমহিলা এলেন। তাকে মুকুল পাউরুটি টোস্ট আর ডিমের অমলেট খেতে দিল। আর গজগজ করে প্রাণের ব্যথা জানাতে লাগল। শাশুড়ি কোথা থেকে দু'টো বোনঝি-ভাইঝি ধরে এনেছে তারাই দৈত্যর মতো সব খাবার শেষ করেছে নাকি!
"তুই সহ্য করলি কেন? ঝাঁটা মেরে বিদায় করতে পারলি না? বুড়িটা সুদ্ধ?"
"তাই করতে হবে। আজ এই খাও। আমি পরে ওদের দেখছি।"
একটু পরে সুহাসিনীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল মুকুলিকা, "এই যে শাশুড়ি, জমিয়ে বসেছ দেখছি। একেবারে টুঁ শব্দ যেন না হয়। আমার মা এখন ঘুমোবে। নইলে পার্কে গিয়ে হ্যা-হ্যা-হি-হি করোগে যাও।"
মুকুলিকার কথা শেষ হওয়া মাত্র শর্বরী উচ্চস্বরে হা-হা করে হেসে উঠল।
"এই কী হচ্ছে, অ্যা!"
"ওরা আমার আত্মীয়, তুমি ওদের চোপা করছ বউমা?" সুহাসিনীর সাহস হয়েছে একটু।
"খুব কথা হয়েছে দেখছি তোমার? বোনঝি-ভাইঝিকে দেখে তেল বেড়েছে, নাকি?"
"এইবার উঠতেই হল," এই বলে রাগিণী ঘর থেকে বেরোল।
সোজা এসে মুকুলের মা'কে বলল, "এই যে, খাওয়া হয়েছে? এবার পাতলা হও।"
বাসনা চমকে উঠল, "এ নমুনাটি কে রে মুকুল?"
শর্বরী এগিয়ে এল, "নমুনা দেখার বাকি আছে এখনও। শুনুন, আপনার বউমা বুঝি আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে? তাই মেয়ের স্কন্ধে ভর করেছেন?"
"ইস। আমাকে চেনো না তুমি, আমার নাম বাসনা। বউমা-ফউমা নেই আমার।"
"বিদায় হও বাসনা, কাল থেকে আর এসো না।"
মুকুলিকা এসে শর্বরীর চোখের সামনে হাত নাচাল, "এই-এই, কী বললে মা'কে?"
মুকুলের হাতটা খপ করে ধরে মুচড়ে পিছনে নিয়ে গিয়ে উলটে চেপে ধরল শর্বরী।
"আঃ আঃ লাগছে। ছাড়ো-ছাড়ো।"
"লাগার জন্যই দেওয়া হচ্ছে মুকুল। মা'কে বলো, বাড়ি যাও মা।"
মুকুল ভীষণ রেগে গিয়েছে, অন্য হাতটা দিয়ে শর্বরীকে ধরতে গেল, সেই হাতটাও মুচড়ে পিছনে নিয়ে গিয়ে জোরে চেপে ধরল, "মা'কে বলো, বাড়ি যাও। নইলে

তোমার হাত ভেঙে দেব। বলো।''
''মা বাড়ি যাও। কাল এসো।''
''না। বলো, বাড়ি যাও। রোজ-রোজ আর এসো না।''
মুকুলের হাতে সত্যিই খুব লাগছিল, বলল, ''বাড়ি যাও, রোজ-রোজ এসো না।''
বাসনা আগুন চোখে তাকিয়ে গটগট করে বেরিয়ে গেল।
শর্বরী ছেড়ে দিল মুকুলিকাকে, বলল, ''যাও, এখন গিয়ে বিশ্রাম করো। বিকেল পাঁচটায় চা খাব আমরা। তখন উঠলেই হবে। আমাদের চা করে দেবে।''
''চা করে দেব?' নিজের দু'টো হাতেই হাত বুলোচ্ছিল মুকুল, বেশ লেগেছে ওর। রাগে কাঁপতে-কাঁপতে বলল, ''চা করে দেব? আমি আগে থানায় যাব। সবক'টার নামে ফোর নাইনটি এইট এ করে গারদে যদি না পুরেছি তো কী বলেছি।''
''থানায় যাবে? আমরা থানায় ঘুরেই এসেছি। ওখানে তোমার নামে আগেই ডায়েরি করা আছে। যাও না, যাও। গেলে, তোমাকেই আগে অ্যারেস্ট করবে।''
''অ্যাঁ! কী-ই!'' জোঁকের মুখে নুন পড়ার প্রবাদটা আগে শুনেছিল রাগিণী। এখন চাক্ষুষ করল।
মুকুলিকা দুমদুম করে নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিল।

বিকেল হতে না হতেই দরজায় ঘা দিল রাগিণী, ''মুকুলিকা-মুকুলিকা, ওঠো সোনা, চা।'' রাগিণীর এইরকম মিষ্টি স্বরে মুকুলিকা চমকে গেল! কী ব্যাপার! তাহলে কি মলয় এসে ওদের কিছু বলেছে? দেখা যাক আর একটু সময়। এবার শর্বরী এসে ডাকল, মিষ্টি সুরে, ''মুকুল-মুকুল, চা।'' এবার একটু ইতস্তত করে দরজাটা খুলল মুকুলিকা। অনেকক্ষণ ধরে চা নিয়ে সাধাসাধি করছে ওরা। খেয়ে নেওয়াই ভাল। ঠান্ডা হয়ে যাবে। দরজা খুলে ও যথেষ্ট গাম্ভীর্য নিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসল, ''কোথায় চা, দাও।''
''আমরা তো তাই বলছি। কোথায় চা? দাও।''
''মানে?''
''সন্ধে হতে চলল, চা বানাবে না?''
''আমি? আমি চা বানাব বলে সবাই বসে আছ?''
''ঠিক তাই'', শর্বরী বলল, ''যাও, শুনে নাও ক' কাপ হবে। মলয়ের জন্যও এক কাপ বানাবে, ফ্লাস্কে থাকবে। ও এসে খাবে।''
নন্দিনী বলল, ''আমিও খাব। জীবনে প্রথম বউদির বানানো চা।''

মলয় একটু পরে এল। সুহাসিনী আলাপ করিয়ে দিল রাগিণী আর শর্বরীর সঙ্গে। ওরা মলয়ের ঘরে মলয়কেই আপ্যায়ন করল, ''এসো মলয়, চা খাও।''
''এই সময়ে চা? পাওয়া যাবে নাকি?''
''পাওয়া যাবে মানে, অবশ্যই পাওয়া যাবে, তোমার বউয়ের বানানো চা। খাও।''
''কী? মুকুল চা বানিয়েছে? আমাদের জন্য? হোয়াট আ সারপ্রাইজ়!''
মলয়ের হাত থেকে চা পড়ে যায় আর কি একটু হলে।
''আরও সারপ্রাইজ় আছে বাবা। বাসনাদেবীর নির্বাসন, কাল থেকে আর নট আগমন।'' নন্দিনী খিলখিলিয়ে বলল।
'' কী বলিস কি? এক দিনে এত পরিবর্তন?''
অনেক দিন পর মায়ের মুখে হাসি দেখল মলয়। বেশিরভাগ দিনই তাঁর চোখে জল দেখে। আজ বড্ড ভাল লাগল।
''কী করে এটা সম্ভব হল মা?''
''সবই আমার বোনঝি-ভাইঝির জন্য।''

একটু পরে পুষ্প এলো, মানে সুহাসিনীদের বাড়ির কাজের লোক। তাকে কাছে ডাকল রাগিণী, ''তোমার নাম তো পুষ্প, ঠিক? এই নাও পঞ্চাশ টাকা, তুমি মিষ্টি খাবে। আমাদের কথাগুলো একটু বুঝে নেবে। অনেক মিষ্টি খেতে পাবে তাহলে।'' পুষ্প হেসে ঘাড় নাড়ল। টাকা ক'টি আঁচলে বাঁধল।
''পুষ্প, এ বাড়ির গিন্নি কে?'' শর্বরীর প্রশ্নের জবাবে পুষ্প আশ্চর্য হয়ে বলে উঠল, ''কেন, বউদি।''
''না, এ বাড়ির গিন্নি হলেন মাসিমা! মনে থাকবে?''
''আচ্ছা, থাকবে।''
''রাতে তোমার রান্নায় কে সাহায্য করে?''
''মাসিমাই করেন। বউদি টিভি দেখে, তাঁর মায়ের সঙ্গে।''
''আজ থেকে বউদি তোমার রান্নায় সাহায্য করবে, মাসিমা সন্ধের পর টিভি দেখবেন। আর বউদির মা, তাঁর নিজের বাড়িতে বসে টিভি দেখবে, মনে থাকবে?''
''থাকবে। আজ রাতে কী রান্না হবে?''
''আজ দাদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করে নাও। প্রত্যেক দিন এক একজনের কাছ থেকে মেনু জেনে নেবে। প্রত্যেকেরই যেন ইচ্ছেমতো খাওয়ার সুযোগ আসে। বউদিকেও চান্স দেবে।''
মুকুল খুব শক্ত পাল্লায় পড়ে গেছে। থানার ভয় আর দেখানো যাবে না। ওরা আগেই থানা ঘুরে এসেছে। বোনঝিটার তো আবার হাতও চলে। সন্ধেবেলার সিরিয়ালগুলো মাঠে মারা গেল। যাই হোক করে মলয়কে দিয়েই ওই ভাইঝি-বোনঝি পালা সাঙ্গ করতে হবে।
রাতে মলয় আজ তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ল। মুকুল জেগে বসে ছিল, ''তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ছ কেন? তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।''
''খুব ঘুম পাচ্ছে আজ। তৃপ্তির ঘুম। আঃ কত দিন পর আমার পছন্দের মেনুতে রান্না হল।'' মলয় সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল। স্বামীর কাছে পাত্তা না পেয়ে মুকুলিকা খুব দমে গেল।

সকাল হতেই সে ব্যাগ গুছিয়ে বলল, ''আমি মায়ের কাছে যাচ্ছি।''

সুহাসিনী বললেন, "কখন আসবে মুকুল? বাড়ি এসে দুপুরে ভাত খাবে তো?"
"কেন শাশুড়ি? যারা এসেছে তাদের নিয়ে আনন্দে খাও। তোমার ভাতে আমি 'ইয়ে' করি!" এই বলে মুকুল গটগট করে বেরিয়ে গেল। তারপর রাগিণীরা যখন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে, ঘড়িতে প্রায় আড়াইটা বাজতে চলেছে, তখন মুকুল এল। এসে হাত মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে গিয়ে চিৎকার করে উঠল, "আমার ভাত কোথায়?"
রাগিণী ডিভানে শুয়েছিল বাইরের ঘরে, চমকে উঠল। সুহাসিনী ছুটে এলেন।
রাগিণী শান্তস্বরে বলে উঠল, "ভাত সব পুষ্পকে দিয়ে দিয়েছি। কেন, মা খেতে দিল না?"
মুকুলিকা রাগের চোটে জলের জগটা তুলে রাগিণীকে ছুড়ে মারতে গেল।
রাগিণী বলল, "সারা ঘর মোছাব কিন্তু তোমাকে দিয়ে।"
থমকে মুকুলিকা জগটা নামিয়ে রাখল।

কাজ করতে হবে না, ভাল ব্যবহার করলেই হবে।"
মুকুলিকা ঘরে চুপ করে বসে আছে। তার সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে আজ অনেক আশা নিয়ে মায়ের কাছে গিয়েছিল। ওকে মা বলেছে, "কাল তো বাড়ি যাও বলে আমাকে তাড়িয়ে দিলি। আমি তোর ছোটমাসির বাড়ি চলে যাচ্ছি। রান্না-বান্নার অভ্যেস কত দিন নেই আমার। এখানে খাওয়া-দাওয়া হবে না। তুই তোর বাড়ি চলে যা।"
ভাবতে-ভাবতে মুকুলিকার সব রাগ গিয়ে পড়ল সুহাসিনীর ওপর।
নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। সোজা গেল সুহাসিনীর ঘরে।
"এই যে শাশুড়ি, বোনঝি-ভাইঝি পেয়ে সাপের পাঁচ পা দেখেছ? কালই যদি ওদের না তাড়াও তো তোমার মজা আমি দেখাব।"
"আমাকে তাড়াতে হবে না, তুমি শুধরে গেলে ওরা নিজেরাই চলে যাবে।"

মুকুল শক্ত পাল্লায় পড়ে গেছে। থানার ভয় আর দেখানো যাবে না। ওরা আগেই থানা ঘুরে এসেছে।

একবার আগুন চোখে সুহাসিনীর দিকে তাকাল, তারপর নিজের ঘরের দিকে চলল হনহন করে।
পিছন থেকে শর্বরী বলল, "আজ দুপুরে কালকের রিপিট টেলিকাস্টগুলো মিস কোরো না।'

বিকেলে চা-জলখাবার আজ রাগিণীই বানালো। নন্দিনীকে দিয়ে মুকুলিকার ঘরে পাঠিয়ে দিল। নন্দিনী ফিরে এলে, জিজ্ঞাসা করল, "নিল?" নন্দিনী হাসল, "হ্যাঁ, খেতে শুরু করেছে।" শর্বরী সুহাসিনীকে বলল, "আমরা দু'জনে একটু বেরোব, দরকার আছে। পুষ্প এলে আজ তুমি ওকে সাহায্য কোরো। ও টিভি দেখলে দেখুক। তুমি কাজ করবে, ও বসে থাকবে। সেটা যেমন ভাল নয়, তুমি বসে থাকবে ও একা খাটবে, সেটাও উচিত নয়। মিলেমিশে থাকতে হবে। নিজেদেরই তো সংসার।"
"আমি মিলেমিশেই থাকতে চাই। ওকে

"আচ্ছা! আমি খারাপ, তাই ওদের ডেকে এনেছ? দেব নাকি সেদিনের মতো মাথা ঠুকে?" মুকুলিকা সুহাসিনীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, পিছন থেকে কেউ ওর কাঁধ দু'টো খামচে ধরল। পিছন ফিরল ও, দেখল শর্বরী!
"এখনই মাসির কাছে ক্ষমা চাও। না হলে তোমার চুলের মুঠি ধরে তোমার মাথা অনবরত দেওয়ালে ঠুকব।"
মুকুলিকা সত্যিই ভয় পেয়ে গেল, "আমার ভুল হয়েছে, ছাড়ো আমাকে।"
"আমাকে নয়, ওঁর কাছে ক্ষমা চাও। বলো, মা, আমার ভুল হয়েছে আর হবে না।"
মুকুলিকার কাঁধের চাপ আরও শক্ত হল। ও মুখ নিচু করে সুহাসিনীর কাছে ক্ষমা চাইল। রাগিণী একটা সাদা খাতা আর পেন দিল মুকুলিকাকে।
"এখানে লেখো, আমি বাড়িতে কখনও কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করব না। ভদ্র ও সংযতভাবে থাকব। যদি না থাকতে পারি, আমাকে পুলিশে দেওয়া হবে।"
"আমি লিখব না ও সব।" মুকুলিকা গোঁ দেখাল।
"আমরা তাহলে কোনও দিন এখান থেকে যাব না। তাতে তোমার দুঃখ বাড়বে, কমবে না।"
তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুকুলিকা কথাগুলো লিখে, সই করল।
শর্বরী বলল, "এটায় আমরা আই-উইটনেস হিসেবে সই করে থানায় জমা দেব।"

পরদিন সকালে শর্বরী-রাগিণী সুহাসিনীর কাছ থেকে বিদায় নিল।
সুহাসিনী ওদের দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমরা কে আমি জানি না। কিন্তু আমার জন্য যা করলে, কোনও দিন ভুলব না।"
"আমরা হলাম ঝটিকা বাহিনী। কোথাও বাঁকা লাইন দেখলেই ঝড় তুলে সোজা লাইন করে দিই।" রাগিণী বলল।
"তোমাদের ঝটিকা বাহিনীতে আমারও নাম লেখানো থাকল। দরকার হলে বোলো।"
"সত্যিই?"
"সত্যিই।"
"বেশ। কিন্তু এখানে আপনার দরকার হলেই ফোন করবেন। না করলেও ভাব করবেন, এই করছেন। তাতেই কাজ হবে।" ওরা বেরিয়ে এল।
শর্বরী বলল, "থানায় যাবি নাকি?"
রাগিণী মুকুলের সই করা কাগজটা ছিঁড়ে দিয়ে বলে উঠল, "পাগল!"

৫

রাগিণীর সঙ্গে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল কিশোরের। রাগিণী মিনিবাসের টিকিট কাটতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে কেউ একজন বলে উঠল, "থাক কাটতে হবে না, আমিই কাটছি।" পিছন ফিরল রাগিণী, "আরে কিশোর! তোর বাইক কোথায়? মিনিবাসে যাচ্ছিস?"
কিশোর একটু হাসল, হাসিটা ফ্রিজে থাকা বাসি সন্দেশের মতো, হাসি বটে কিন্তু শুকিয়ে কাঠ, "ওই, বিক্রি করে দিতে হল আর কি?"
কিশোর বাইক বিক্রি করে দিয়েছে? বিশ্বাস করা শক্ত। নিশ্চয়ই প্রেমে পড়েছে। আর নতুন প্রেমিকার অভিমান পুরনো না হতেই বাইক বিদায়।
"তুমি নামবে কোথায়?"
"চৌমাথা, তুই?"

"তোমার সঙ্গে নেমে পড়ব।"
মিনিবাস থেকে দু'জনেই একসঙ্গে নামল। কিশোর রাগিণীর সঙ্গে সঙ্গেই হাঁটতে লাগল। রাগিণী জিজ্ঞাসা করল, "তোর গন্তব্য কোন পথে?"
"চলো, আপাতত তোমাকে এগিয়ে দিই অফিস পর্যন্ত।"
"কী ব্যাপার বল তো? অমন উড়ো-উড়ো ভাব করছিস কেন? কী হয়েছে?"
"আমার মন খুব খারাপ রাগিণীদি।"
কিশোর রাগিণীর চেয়ে বয়সে একটু ছোট। কিন্তু এক সময় খুব বন্ধুত্ব ছিল। খুব প্রাণবন্ত, দিলখোলা ছেলে কিশোর। একটু সময় কিশোরের দিকে তাকিয়ে দেখল রাগিণী, "কী হয়েছে বল তো?"
"না, থাক, বলে কী হবে। মাঝখান থেকে তোমার অফিসের দেরি হয়ে যাবে।"
"সে আমি বুঝব, চল দেখি আমার সঙ্গে।"
কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে রাগিণী অফিসের রিসেপশনে বসল। ওখানে বসার জায়গা আছে। কফিও পাওয়া যায়। কিশোরকে কফি আনিয়ে দিল রাগিণী। "এবার বল", মৃদু গলায় বলল রাগিণী।
"দিদির বিয়ে হয়েছে দু'বছর। পাত্রপক্ষের যা-যা দাবি ছিল, সাধ্যমতো সবই দিয়েছি। প্রথম কিছু দিন ভালই ছিল। দু'বাড়ির যাতায়াতও ছিল। তারপর শুরু হল, নানা অজুহাতে এটা চাওয়া, ওটা চাওয়া। না পেলে দিদির সঙ্গে দুর্ব্যবহার। শাশুড়ি অত খারাপ নয়, কিন্তু শ্বশুর মারাত্মক।
জামাইবাবুকে রীতিমতো চালায় ব্যাটা। জামাইবাবুও তেমন। বাপের সুপুত্র হয়ে কাজ করে। শাশুড়ি সরাসরি তেমন কিছু করে না, তবে ভাবখানা এই যে, আমি যথেষ্ট সহ্য করেছি, এবার তুমিও করো।"
"তোরা ওদের খাই মিটিয়ে চলেছিস সমানে?"
"কী করব! দিদির মুখ চেয়ে করতেই হচ্ছে। দেখো না, বাইকটাও বিক্রি করে দিলাম। তুমি তো জানো, কীরকম প্রিয় ছিল ওটা আমার।"
"হুঁ। ভাবছি।" সত্যিই রাগিণীকে খুব সিরিয়াসলি ভাবতে দেখা গেল।
"বলো, কী ভাবছ? ওই শ্বশুরকে বুঝিয়ে কিছু হবে না। অনেক চেষ্টা করেছি।"
"ওটা নয়। অন্য কথা ভাবছি। ভাবছি, ঝটিকা বাহিনী কাজ করবে কি না।"
"ঝটিকা বাহিনী? কী কাজ করে তারা?"
"ঝড় তোলে। শোন কিশোর, তোকে একটা কাজ দিচ্ছি। তার আগে বল, তোর দিদিকে কি মারধোর করেছে?"
"হ্যাঁ, দিদির শ্বশুর একদিন-দু'দিন মেরেছে দিদিকে। দিদি জামাইবাবুকে বলেছিল, জামাইবাবু কোনও প্রতিবাদ তো করেইনি, উলটে দিদিকেই দোষ দিয়েছে। একদিন তো জামাইবাবুর সামনেই...।"
"ঠিক আছে। তুই দু'টো খবর আমাকে এনে দিবি। যেভাবেই পারিস। তোর জামাইবাবুর বিয়ের আগে কোনও প্রেম-টেম ছিল কি না, কিংবা অফিসে ঝামেলা হয়েছিল কি না কোনও ব্যাপার নিয়ে। আর দিদির শ্বশুরের কোনও পুরনো কেচ্ছা আছে কি না?"
"ক'দিনের মধ্যে আনব?"
"যত তাড়াতাড়ি পারিস। আমার ফোন নাম্বারটা নিয়ে যা। কাজটা এগোলে, ফোন করবি।"
কিশোর চলে গেল। রাগিণী অফিসের উপরে উঠে গেল। লাঞ্চ ব্রেক-এ রাগিণী ফোন করল শর্বরীকে।

রাগিণী আর শর্বরী কিশোরের আসার আগেই নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই কিশোর এসে গেল। ওরা একটা ছোট চা-জল খাবারের দোকানে গিয়ে বসল। কিশোর বোধহয় প্রচুর ঘুরে-ঘুরে আসছে, বলল, "ভীষণ খিদে পেয়েছে।"
রাগিণী কিশোরের জন্য চারটে কচুরির অর্ডার দিল। আর নিজেদের জন্য চা-শিঙাড়া। শর্বরীর সঙ্গে কিশোরের ফোনে আলাপ হয়ে গেছিল এর মধ্যে, এখন চাক্ষুষ দেখা হল। কিশোর বলতে শুরু করল, "বিয়ের আগে জামাইবাবুর সঙ্গে দু'টো মেয়ের প্রেম ছিল। একটা তেমন জমাটি নয়, এলেবেলে গোছের, তার নাম বিউটি। আর একটা প্রেম বেশ পেকে এসেছিল। কিন্তু জামাইবাবু পাকা ঘুঁটি ঘরে না তুলে দিদিকে বিয়ে করেছে। দু'টো কারণে, প্রথমত দিদিকে দেখতে সুন্দর, পালটি ঘর। আর দ্বিতীয়ত ওদের দাবি আমরা সবই মেনে নিয়েছিলাম। সেই দ্বিতীয় প্রেমিকাটি বেশ চোখা ছিল, সহজে ছাড়তে চায়নি জামাইবাবুকে। ওরা বাড়ি বদলে ফেলে বিয়ের আগে।"
"মেয়েটির নামধাম?" শর্বরী জিজ্ঞাসা করল।
"মেয়েটির নাম তানিয়া, থাকে বেনিয়াটোলায়। এখনও বিয়ে হয়নি।"
"বেশ, এ দিকটা হল, আপাতত এতেই হবে। শ্রীশ্বশুরের কোনও খবর?"
"শ্বশুর যত দিন অফিসে কাজ করেছে, সবাইকে জ্বালিয়েছে। কেউ পছন্দ করত না, ওর রিটায়ার করার সময় কেউ ওকে 'ফেয়ারওয়েল' পর্যন্ত দেয়নি। তাছাড়া একবার নাকি টাকা চুরির ব্যাপারে ধরা পড়েছিল, প্রচুর হাতে পায়ে ধরে ছাড়া পায়। তখন নাকি বলেছিল, অবসরের পর যখন টাকা পাব, তার থেকে 'ওটা' শোধ দিয়ে দেব। কিন্তু চলে এসেছে অবসর নিয়ে, ওমুখো আর হয়নি। ওরাও বোধহয় ক্ষমা-ঘেন্না করেই ছেড়ে দিয়েছে।"
"দুর্দান্ত হোমওয়ার্ক করেছ কিশোর। ভাবছি তুমি ছেলে হলেও আমাদের ঝটিকা বাহিনীতে নিয়ে নেব।" শর্বরী হেসে বলল।
"এক কথায় আমি রাজি।"
ততক্ষণে কচুরি-তরকারি এসে গিয়েছে। কিশোর খেতে শুরু করল। রাগিণী আর শর্বরীর সামনে চা-শিঙাড়া এনে রাখল যে বাচ্চা ছেলেটা, তার দিকে তাকিয়ে রাগিণী একটু হাসল। ছেলেটার বয়স মেরে-কেটে দশ-এগারো। মুখটা মিষ্টি, তবে মলিন। ওর

দিকে তাকিয়ে শর্বরী জিজ্ঞাসা করল, "তোমার নাম কী?"
আস্তে, গলা নামিয়ে, লাজুক স্বরে ও বলল, "পটকা।"
শর্বরী বলল, "পটকা, একটা শিঙাড়া খাবি?"
পটকা মাথা নাড়ল। ভয়ে-ভয়ে মালিকের দিকে তাকাল। গেটের পাশে শো-কেসের ধারে যে বয়স্ক লোকটা বসে আছে সেই দিকে।
ওরা নিজেদের কথায় ফিরে এল। রাগিণী কিশোরকে বলল, "আমি বিউটি হয়ে তোর জামাইবাবুকে ফোন করব। একটা চাপ, আর কী! আর শর্বরী, তানিয়া। তবে দু'জনেই ফোন করলে একঘেয়ে লাগবে। কিশোর, তোর জামাইবাবুর কি ফেসবুক আছে?"
"না-না, অত শৌখিনও নয়, শিক্ষিতও নয়। বাড়িতে কোনও কম্প্যুটারই নেই। মোবাইল নম্বরটা দিতে পারি।"
"ঠিক আছে, তাতেই হবে। আর শ্রীশ্বশুরকে নিজে ফোন করবি। প্রথমে বলবি, আপনাদের যা দাবি ছিল সবই তো দিয়েছি। এখন কেন দিদিকে চাপ দিচ্ছেন?"
"বললে শুনবে? উল্টে আমাকেই..."
হাত দিয়ে থামাল রাগিণী কিশোরকে, "সবটা শোন, শ্রীশ্বশুর যে প্রথমে কী বলবে সেটা আমি যথেষ্ট অনুমান করতে পারি। প্রথমে তুই ভাল-ভাল কথা বলবি। বলবি, আমরা ভেবেছিলাম, দিদি আপনার মেয়ের মতো হয়ে থাকবে, ইত্যাদি।"
"তারপর যদি খ্যাঁচায় আমাকে?"
"খ্যাঁচাবেই তো। তার সঙ্গে তোর দিদির অনেক দোষের কথা বলবে, এই পারে না— সেই পারে না। এই দোষ— সেই দোষ। তুই বলবি, মানুষ মাত্রেই দোষে-গুণে। নিজেরা তো একটু মানিয়ে নিলেই হয়। এই যেমন আপনার অফিসের ব্যাপারটা, আমি সবই জানি, কিন্তু কখনও কাউকে বলেছি? দিদিকেও বলিনি।"
"তারপর—তারপর?" কিশোর সাগ্রহে উল্লসিত। রাগিণীও হাসছিল, "দেখবি এই অবধি বলেই কী কাজ হয়। বাকিটা তুই খেলাবি।"
"পারব বল, নিশ্চয়ই পারব। ওকে আমি গুগ্‌লি যা দেব না!"
তিনজনেই হেসে উঠল।
ওরা উঠে পড়েছিল। দোকান থেকে বেরিয়ে আসবে এমন সময় দরজার সামনে একটা হইচই শোনা গেল। ওরা গিয়ে দেখল, পটকা খুব কাঁদছে। বয়স্ক লোকটা ওকে ভীষণ ধমকাচ্ছে, আর দোকানেরই একটা ছেলে পটকার ডান হাতে জল ঢালছে।
"কী হয়েছে?" রাগিণী জিজ্ঞেস করল। যা শোনা গেল, তার সারমর্ম এই, পটকা চায়ের কাপ-ডিশ ধুচ্ছিল, হঠাৎ একটা কাপ ভেঙে ফেলে। উনোনের ওপর কেটলিতে চায়ের জল ফুটছিল, ওই লোকটা সেই জল পটকার হাতে ঢেলে দিয়েছে খানিকটা। কাপ ভাঙার শাস্তি। শর্বরী তাকাল লোকটার দিকে, বলল, "মাথা ঠান্ডা করুন। কী করবেন বলুন, এই সব ছোট-ছোট ছেলেমেয়েগুলো যা দুষ্টু হয়, সামলানো যায় না।"
রাগিণী অবাক হয়ে গেল শর্বরীর অমন মিহিসুরে কথা বলা শুনে। কিশোরও অবাক। ওর তো লোকটাকে ধরে থাপ্পড় কষাতে ইচ্ছে করছিল। পটকা খুব কাঁদছে। অন্য বড় ছেলেটা হয়তো মনে-মনে লোকটার উপর রেগে গিয়েছে কিন্তু শত হলেও মালিক, মুখের উপর প্রতিবাদ করার সাহস নেই। চুপচাপ পটকার হাতে জল ঢেলে চলেছে।
শর্বরী এগিয়ে গিয়ে লোকটার হাতে খাবারের দাম দিল। লোকটা হাত পেতে নিতেই যেন চমকে উঠল শর্বরী, "দেখি-দেখি, আপনার হাতটা দেখি।"
"মা-লক্ষ্মী কি হাত দেখতে জানেন নাকি?" ধুমসোর মুখে অমায়িক হাসি।
"হুঁ, তা তো একটু জানি। কিন্তু সব আঙুলেই তো আংটি পরে রয়েছেন, অন্য আর কী বলব? তবে আপনার ভাগ্য কিন্তু সুপ্রসন্ন। চমৎকার হাত।"
"একটু দেখুন না!" মুখে কচলানো হাসি উপচে পড়ল মালিকের।
"এই দিকে আসুন, বাইরের দিকে, একটু আলোতে। বসুন তো চেয়ারটায়। কী আর দেখব? ছোট থেকে খেটে বড় হয়েছেন, অনেক ঝামেলা সহ্য করেছেন, না?"
"একেবারে ঠিক বলেছেন।"
কিশোর আর রাগিণী ভ্যাবাচাকা! শর্বরী দিব্যি লোকটার হাত দেখতে শুরু করে দিয়েছে। এই বিদ্যা আছে নাকি ওর?
শর্বরী দোকানের ছেলেটাকে বলল, "খুব জল ঢালো তো পটকার হাতে। তারপর টুথপেস্ট লাগিয়ে দেবে। আর শোনো, ওকে দোকান থেকে দু'টো মিষ্টি খাইয়ে দাও।"
ছেলেটা মালিকের দিকে তাকাল, মালিক বলল, "দাও খাইয়ে। উনি যখন বলছেন।"
তারপর শর্বরীর দিকে তাকিয়ে বলল, "দেখবেন না, আমার হাতটা?"
"হুঁ দেখব তো।" শর্বরী আবার লোকটার হাতে মনোযোগী হল, "দেখুন, আপনার কাপটা যে ভাঙবে জানা ছিল। দেখুন, আপনার হাতেই লেখা রয়েছে, আপনার আজকের দিনটা খারাপ যাবে।"
"লেখা রয়েছে? হাতে?"
"হুঁ রয়েছে। তবে এর পর থেকে আর খারাপ হবে না। এর পর সবই ভাল।"
"সত্যি? মা-লক্ষ্মী, সত্যি বলছেন!"
"হ্যাঁ। তবে দু'টো হাতের পাতা জোড়া করুন তো।" লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে দু'টো হাতই পাতল। শর্বরী বলল, "এবার চোখ বুজে ঠাকুরের নাম করে জোরে-জোরে তিনবার বলুন দেখি— আজই শেষ হোক সব শান্তি, কাল থেকে আমি নতুন মানুষ হব।" লোকটা গদগদ স্বরে চোখ বুজে হাত পেতে বলতে শুরু করল— "বাবা ভোলানাথ, আজই শেষ হোক সব শান্তি..."
তিনবার বলার অনেক আগেই শর্বরী উনানের উপর থেকে কেটলিটা নিয়ে লোকটার হাতে ফুটন্ত জল ঢেলে দিল হড়হড় করে! লোকটা পরিত্রাহি চিৎকার করে লাফিয়ে উঠল, "ওরে বাব্বা গো, জ্বলে গেল, মরে গেলাম। বদমাশ মেয়ে..."
শর্বরী কিশোরের দিকে তাকাল, "টেক কেয়ার কিশোর।"
কিশোর লাফিয়ে উঠে লোকটাকে চেপে ধরে প্রথমে বলল— 'চো-প'! তারপর বলল, "কেমন লাগছে? বুড়ো ভাম একটা। এসো শিগ্গির এদিকে।" বলে লোকটাকে টেনে ধরে বাইরের কলের সামনে বসিয়ে দু'টো হাতের পাতাই জলের তলায় মেলে ধরল। হাতে ঝরঝর করে জল পড়ছে আর লোকটা অন্যান্য খদ্দেরের দিকে তাকিয়ে চেঁচাচ্ছে, "আপনারা দেখলেন তো কাণ্ডটা। কী সাংঘাতিক মেয়ে! ওরে বাবা'গো-মা'গো।"
দোকানের কেউ কোনও কথা বলল না। বরং পুরো ব্যাপারটা ওরা বোধহয় উপভোগই করছিল। একজন বয়স্ক লোক শুধু বলল, "আপনার মা-লক্ষ্মী তো ভাল কাজই করেছেন। কাল থেকে ভাল মানুষ হবেন। আর আপনি যখন বাচ্চাটার হাতে গরম জল ঢেলে দিলেন তখনই আপনার এবড়ো খেবড়ো দাঁতগুলো সমান করে দেওয়ার জন্য আমার হাতটা নিশপিশ করছিল।" ধুমসোর ঘাড় হেঁট হয়ে গিয়েছে।
কিশোর বলল, "এভাবে কলের নীচে হাত পেতে বসে থাকুন কিছুক্ষণ। পরে যা খুশি ওষুধ বা মলম লাগিয়ে নেবেন। আর হ্যাঁ, পটকাকে দিদিরা নিয়ে গিয়েছে, ও আর এখানে কাজ করবে না। ওর যা মাইনে পাওনা আছে আমি একসময় এসে নিয়ে যাব।"

"ই-স, মামদোবাজি নাকি? দেশে থানা-পুলিশ নেই?"
"হ্যাঁ আছে নিশ্চয়ই। উনিশশো ছিয়াশি সালে চাইল্ড লেবার আইন পাশ হয়েছে। সেই আইনে আপনাকে লটকে দেওয়া শক্ত হবে না। চলি।"

রাগিণীরা পটকাকে নিয়ে সুহাসিনীর কাছে এল।
ওদের দেখে সুহাসিনী খুব খুশি, "আরে এসো-এসো, এত দিনে আমার কথা মনে পড়ল?"
"না, মাসিমা একটা কাজে এসেছি। এই ছেলেটি আপনার কাছে থাকবে। ওর নাম পটকা। নামে পটকা তবে খুব শান্ত। ও আপনাদের ঘরে ছোটখাটো কাজ-টাজ করবে। ওকে মাইনে দিতে হবে না কিন্তু পড়াতে হবে। এখন তো ছোটদের সব স্কুলই অবৈতনিক। বই-টই আমরাই দরকার হলে কিনে দেব। কী রে পটকা, থাকবি তো মাসিমার কাছে?"
পটকা ঘাড় নাড়ল, "থাকব।"
রাগিণী বলল, "ছেলেটাকে ভরসা করে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। দোষ করলে শাসন করবে কিন্তু মারধোর কোরো না। আর ও যদি সেরকম কোনও অন্যায় করে আমাকে জানিও। তুমি তো বলেছিলে আমাদের বাহিনীতে যোগ দিতে চাও। মনে করো, এ একরকম যোগ দেওয়াই হল তোমার।"
"শোনো ভাইঝি সোনা, অত বক্তৃতা দিও না আর। পটকা কেমন থাকছে নিজেই পরে খোঁজ নিও। এখন বোসো, চা-টা খাও।"
"এখন আর কিছু খাব না মাসিমা। তবে মুকুলের সঙ্গে একবার দেখা করে যাই। ডাকো তো ওকে। কেমন আছে এখন?"
"ভাল আছে। একেবারে শুধরে গিয়েছে ও। আমাদের সেদিন থানায় যাওয়ার কথাটা বলায় একেবারে মোক্ষম কাজ হয়েছে।"

একটু পরে মুকুল এসে দাঁড়াল। দেখেই বোঝা গেল মুকুলের বাচ্চা হবে। ওর দিকে তাকিয়ে রাগিণী বলে উঠল, "কেমন আছ মুকুল?"
গম্ভীর হয়ে মুকুল জবাব দিল, "ভাল আছি।"
"তোমার জন্য একটি সব সময়ের কাজের ছেলে নিয়ে এলাম। মাসিমা তোমার জন্য এত চিন্তা করেন, তোমার কষ্ট হচ্ছে বলে খুব ভাবছিলেন।"
"ভালই করেছ। আমার সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল। ও থাকবে তো?"
"থাকবে, একটু স্নেহ দিও। ভালবাসা দিয়ে দুনিয়া কিনে নেওয়া যায়, একটা ছোট ছেলে থাকবে না? আর একে তোমার মাইনেও দিতে হবে না।"
মুকুলের মুখে এবার হাসি এল, "সত্যি! তাহলে তো এবার তোমাদের উপর আমার খুশি হওয়ারই কথা।"
সুহাসিনী বলে উঠলেন, "তবে আমি ওকে একটু পড়াতে চাই। অলস মস্তিষ্ক দুষ্টুমি বুদ্ধি উসকে দেয়। একটু পড়াশোনা করলে ও ভাল থাকবে।"
রাগিণী খেয়াল করল, মাসিমা 'শয়তানের কারখানা' শব্দ দু'টো পালটে দুষ্টুমি বুদ্ধি উসকে দেয় বলল। ভাল লাগল ওর। সামনেই পটকা দাঁড়িয়ে।
"মুকুল, বাসনা-মা ভাল আছে? ওর সঙ্গে আমরা একদিন দেখা করেছিলাম।
'সরি'-ও বলেছি। উনিও নিজের ভুল বুঝেছেন। তুমি জান?" রাগিণী বলল।
"হ্যাঁ জানি। পটকাকে ভিতরে নিয়ে যাই?"
"হ্যাঁ যাও। পটকা, এ বাড়িটা পছন্দ হয়েছে তো? বউদিকে জ্বালাতন করবি না, সকলের কথা শুনে চলবি, কেমন? তোর জামাকাপড় আর মিষ্টির দোকানের পাওনা টাকা কিশোরদা তোকে দিয়ে যাবে।"
পটকা হেসে মাথা নাড়ল।
শর্বরী পিছন থেকে মুকুলকে ডাকল, "মুকুল, আমাদের উপর হয়তো রেগে আছ, কিন্তু একটা কথা বলছি— জানো তো, যাদের সঙ্গে বসবাস করা হয় তাদের মধ্যে যদি কেউ একজন মনোকষ্টে বা অশান্তিতে ভোগে তাহলে নিজের জীবনযাপনও সুন্দর হয় না। ঠিক বললাম?"
মুকুল সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

৬

কিশোর বেশ সাহস সঞ্চয় করে দিদির শ্বশুর মশাই গোবর্ধন গাঙ্গুলিকে ফোন করল। প্রথমে গোবর্ধন ওকে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছিল না। যাই বলছে কিশোর, তাতেই "আরে, ছাড়ো তো ওসব ফালতু কথা" এই বলে চুপ করিয়ে দিচ্ছিল। ধাপে-ধাপে উঠতে লাগল কিশোর।
দিদির নিন্দা শুনেও মাথা গরম করল না। রাগিণী যেমন শিখিয়ে দিয়েছিল, ঠিক সেভাবে গোবর্ধনের অফিসের প্রসঙ্গটা আনল। আর সঙ্গে-সঙ্গে শ্রীগোবর্ধন মিইয়ে গেল। মিনমিন করে উঠল, "তুমি কী বলছ, তুমি কী বলছ?"
"যা জানি তাই বলছি। তবে সবাইকে বলছি না। শত হলেও আমি আপনার আত্মীয়।"
"বটেই তো—বটেই তো। তুমি আমার একমাত্র বউমার ছোট ভাই।"
কিশোর হাসল মনে-মনে, এতক্ষণ বউটা-বউটা করে চালাচ্ছিল, এখন বউমা বলল। বড়দের মতো করে গলা খাঁকারি দিল কিশোর, "হুঁ, যা বলছিলাম আমি। আপনার অফিসে আপনার কেলেঙ্কারির কথাটা..."
কিশোরকে কথাটা শেষ করতে দিল না গোবর্ধন। মাঝপথেই থামিয়ে দিল ওকে। "শোনো বাবা কিশোর, ফোনে 'এসব' কথা বলতে নেই। তুমি একদিন আমাদের বাড়ি এসো। দিদিকেও দেখে যাও। শত হলেও তুমি ছোট ভাই, বউমা খুশি হবে।"
"সে আমি যাব একদিন কিন্তু আপনাকে কথা দিতে হবে যে দিদিকে আপনি

কোনও কষ্ট দিতে পারবেন না। তাহলে শুধু ফোনে কেন, কাউকেই আমি 'ওই সব' কথা কখনই বলব না।''
''আমি কথা দিচ্ছি। আর তুমি একদিন এসো। আসবে তো বাবা?''
''যাব সময় পেলে। এখন রাখছি।''
তার পরদিনই কিশোরের দিদি তৃপ্তি বাড়িতে ফোন করল। ফোনটা প্রথমে তৃপ্তির বাবা ধরলেন। তৃপ্তির গলা শুনে চমকে উঠলেন। এখান থেকে ফোন গেলেও সব সময় তৃপ্তিকে ডেকে দেওয়া হয় না। আর আজ তৃপ্তি নিজে এই বাড়িতে ফোন করেছে! একটু ভয়ই পেয়ে গেলেন তিনি।
''কী হয়েছে মা, তুই ভাল আছিস তো?''
''কিচ্ছু হয়নি বাবা। আমার শ্বশুরমশাই আজ খুব সদয় হয়েছেন। তিনিই তো আমাকে ফোন করে খবর নিতে বললেন।''
''বাঃ বাঃ। খুব ভাল লোক গোবর্ধনবাবু। কেমন আছেন উনি?''
''ভাল। তোমরা ভাল আছ বাবা?''
''হ্যাঁ। তোমার জন্য দুশ্চিন্তা করা ছাড়া ভালই আছি।''
''দুশ্চিন্তা কোরো না। এ বাড়ির হাওয়া একটু বদলেছে। শ্বশুরমশাই এখন ভাল ব্যবহার করছেন। বাবা, কিশোরকে একটু দেবে?''
''হ্যাঁ, ধর দিচ্ছি।''
কিশোরের ঘরের সামনে গিয়ে কিশোরের বাবা ডাকলেন, ''কিশোর, তোর দিদির ফোন।''
কিশোর ছুটে গিয়ে ফোন ধরল, ''বল দিদি, কেমন আছিস?''
''ভাল আছি। শোন কিশোর, এই রবিবার আমাদের এই বাড়িতে তোর নেমন্তন্ন। আসবি কেমন?''
''হঠাৎ নেমন্তন্ন, কেন রে?''
দিদি ফিসফিস করে বলল, ''জানি না, বুঝতে পারছি না। শ্বশুরমশাই তোকে নেমন্তন্ন করতে বলেছে। তোর সঙ্গে কিছু হয়েছে নাকি?''
''না-না, কিছু হয়নি। তোর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করছে দিদি?''
''অনেকটা পালটেছে। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন কাল, আমাকে তোমার কেমন লোক মনে হয় বউমা? বউমা-টউমা তো বলেন না বেশি। আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, উত্তর দিলাম, কেন, বাবার মতোই মনে হয়। একেবারেই বানানো কথাটা যদিও।''
''বিশ্বাস করল?''
''মনে হয় না। স্থির চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। তোকে ডাকছে কেন কে জানে? মোটা কিছু হাঁকবে না তো?''
''কোনও চিন্তা করিস না। আমি যাব।''

কিশোর সব কথা রাগিণীকে ফোনে বলল। তারপর জিজ্ঞাসা করল, ''আমি যাব নেমন্তন্ন খেতে?''
''যেতে তো হবেই। মাঠে নেমে তো খেলা ছেড়ে চলে যাওয়া যাবে না। তবে বল এখন তোর কোর্টে। ঠিকঠাক বুদ্ধি করে খেলবি।''
''ক্যালাবে না তো?''
''মনে হয় না। সেরকম হলে দিদির উপর দিয়েই শুরু হয়ে যেত। আর শোন, যদি জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা কি আর কেউ জানে? বলবি, হ্যাঁ। কী বলবি, আমি পরে তোকে বিশেষভাবে সেটা শিখিয়ে দেব।''
''ঠিক আছে। তাহলে সেই কথাই রইল।''
''আর হ্যাঁ শোন, শশাঙ্ক গাঙ্গুলিকে তানিয়া আজই ফোন করবে সুতরাং সেও চাপে থাকবে। তুই নার্ভাস হোস না। কাউকে ব্ল্যাকমেল করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা একটা ভাল কাজের জন্য এটা করছি।''
''আর বিউটি? তার কি ফোন করা হয়ে গিয়েছে?''
''না, ভাবছি বিউটিকে টানব না। এখনই দু'জনে একসঙ্গে ফোন করলে শশাঙ্কর সন্দেহ হতে পারে। বরং 'তানিয়া অপারেশন' শুরু করবে।''

শর্বরী সব সময় একটা কথা বলে, ''আমরা কিন্তু কোনও ক্রাইম করব না। শুদ্ধ পথে থেকেও অন্যায়ের প্রতিবাদ করা যায়।''
''হ্যাঁ, যেমন মুকুলিকাকে আমরা সুপথে এনেছি। কিন্তু তোর চোখের সামনে এমন অনেক অন্যায় এসে দাঁড়াবে, যেখানে মীমাংসা এত সহজে হবে না।''
''না পারলে মীমাংসা করব না। মনে রাখিস, আলো জ্বালানোই আমাদের কাজ। আর আমরা কোনও দায় বহন করছি না। অঙ্গীকার শুধু নিজেদের কাছে।''
''বেশ তোর কথা মনে রাখব। আপাতত 'তানিয়া' হবি নাকি? শশাঙ্কর কি এভাবে চৈতন্য জাগানো যাবে?''
''ওদিকে কিশোরের কী খবর?''
রাগিণী কিশোরের অ্যাচিভমেন্টটা বলল। সব শুনে শর্বরী বলল, ''দেখ যদি গোবর্ধন গাঙ্গুলিকে ডাউন করে দেওয়া যায় তাহলে শশাঙ্ককে হয়তো বাগে আনা সহজ হবে কিছুটা। কিন্তু এ মুকুলিকা কেস নয়। তানিয়া শশাঙ্ককে ফোনে ধমকি দেবে আর সে সুড়সুড় করে বউয়ের আঁচলের তলায় চলে যাবে, এটা ভেবে নেওয়া কোনও কাজের কথা নয়।''
''তাহলে কীভাবে এগোব বল?''
''যেভাবে এগোব ঠিক করেছিলাম সেভাবেই এগোব। তবে আমার মনে হয় খোদ তানিয়ার সঙ্গে একটু কথা বলে নিতে পারলে ভাল হত।''
রাজি হল রাগিণী। কিশোরের কাছ থেকে তানিয়ার ঠিকানা আর ফোন নম্বর জোগাড় করে আগে ওরা তানিয়াকেই ফোন করল। মানুষ সম্পূর্ণ অপরিচিতের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে তানিয়া সেরকমই করল। দেখা করতে রাজি হল না। না, বাড়িতে ওদের আসার পারমিশন দিল, না বাইরের কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্টে রাজি হল। শর্বরী অনেক সুন্দর করে বলল যে একটা সামান্য সাহায্যের জন্যই ওরা একটু দেখা করতে চাইছে! তাও যখন কিছুতেই রাজি হচ্ছে না ও, তখন শর্বরী শুধু এইটুকু বলল, ''ব্যাপারটায় শশাঙ্ক গাঙ্গুলি জড়িত।'' এক মিনিট চুপ করে রইল তানিয়া, তারপর বলল, ''শশাঙ্কর সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই আর।''
''সেটা জানি।''
''কোন বিপদে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন বলুন তো? আমি তো আপনাকে চিনিই না।''
''বিশ্বাস করুন আমরা আপনাকে দিয়ে কিছু করাব না। শুধু দু'টো কথা বলব, তাতে আপনার কোনও ক্ষতি হবে না। অন্য কারও উপকার হবে।''
তানিয়া না-না করে অবশেষে রাজি হল। তাও বেশি দূরে সে যাবে না। যদি তার বাড়ির কাছের পার্কটায় দেখা করা সম্ভব হয় তাহলে সে যেতে পারে, তাও অল্প সময়ের জন্য।
''আপনাকে আমি কী করে চিনব বলুন।'' শর্বরী জিজ্ঞাসা করল।
''দেখবেন, ওই পার্কে একটা পরিত্যক্ত খাঁচা আছে। আগে পাখি থাকত, এখন নেই। খালি পড়ে আছে খাঁচাটা। সেই খাঁচার সামনে একটা লাল সিমেন্টের বেঞ্চি আছে। কাল বিকেল সাড়ে চারটের সময় আমি সেই বেঞ্চিটায় বসে থাকব। কিন্তু প্লিজ, আমাকে যেন বেশিক্ষণ বসে থাকতে না হয়। আমি যদি দেখি আপনি নেই তাহলে পাঁচ মিনিটও অপেক্ষা করব না।''
''চিন্তা নেই, আমি আগে যাব।''
শর্বরী বলল, ''রাগিণী, আমরা দু'জনেই যাব, নাকি তুই একা যাবি?''
''দেখ, আমরা একটু বেশি এক্সপোজড হয়ে যাচ্ছি। এটা ঠিক নয়। অন্তরালে থেকে কাজ করাই ভাল। তানিয়ার যদি হঠাৎ পুরনো প্রেম চাগিয়ে ওঠে? যদি আমাদের চিনিয়ে দেয়, তখন? নকল তানিয়া তো

হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে।''

''সেটা ঠিক কিন্তু আমাদের প্ল্যান অনুযায়ী শশাঙ্ককে আমরা মিট করছি না। তানিয়ার নাম করে ফোন করছি। সেখানে আসল তানিয়াকে একটু দেখে রাখা ভাল। যদি ওর কোনও বিশেষত্ব থাকে কাজে লাগবে। বরং দু'জনের যাওয়ার দরকার নেই। আমি একাই যাই। একটু রিস্ক আছে। তানিয়া আমাদের মই বানিয়ে শশাঙ্ককে কবজা করতে পারে।''

''তাহলে তো তোকে একা ছাড়বই না। চল, দু'জনে যাই। তারপর যা হয় দেখা যাবে।''

সাড়ে চারটের আগেই শর্বরী আর রাগিণী নর্থ ক্যালকাটার নামী পার্কটায় গিয়ে উপস্থিত হল। পার্কে পড়ে থাকা খালি খাঁচাটা খুঁজে পেতে দেরি হল না। ওরা দু'জনেই আজ সালোয়ার কামিজ পরেছে। শর্বরী এমনিতে শাড়ি পরে। রাগিণী শার্ট-প্যান্ট। কিন্তু আজ ইচ্ছে করে অন্যরকম সাজল। সালোয়ার কামিজ সবচেয়ে নিরাপদ সাজ। তেমন ঘরোয়াও নয় আবার অফিশিয়ালও নয়।

রোদ প্রায় পড়ে এসেছে। পার্কে বাচ্চারা খেলা করছে। তেমন ভিড় নেই। কিন্তু লোক সমাগম আছে। একটা ফুরফুরে বিকেল।

রাগিণীরা খাঁচার সামনের বেঞ্চটায় গিয়ে বসল না। একটু আড়ালে থাকল। দেখা যাক সে আসে কি না। নাকি সেও দূর থেকে ওদের নজরে রাখে। চারটে পঁয়ত্রিশ নাগাদ একটি সবুজ সিল্কের শাড়ি পরে লম্বা-ফর্সা মাঝারি স্বাস্থ্যের একটি মেয়ে এসে বসল লাল বেঞ্চিটায়।

দু'মিনিটে ওকে জরিপ করল দুই বন্ধু। রাগিণী বলল, ''মেয়েটি মধ্যবিত্ত, চেহারায় পোড়খাওয়া ছাপ আছে। কিন্তু রুচির ছাপও আছে।''

শর্বরী হেসে যোগ করল, ''তানিয়া কিন্তু বাংলা মিডিয়ামে পড়া মেয়ে আর অন্তর্মুখী যাকে বলে।''

''এটা আবার কী করে বুঝলি? আশ্চর্য!''

''ইংলিশ মিডিয়ামের মেয়েরা বিনুনি করে রাস্তায় বেরোয় না। তাছাড়া ওর মধ্যে চাঞ্চল্য নেই। এক মনে খাঁচাটা দেখছে।''

''বেশ চল, এগোনো যাক।''

তানিয়া ওদের দিকে তাকাল। তার চোখে কৌতূহল আছে কিন্তু উঠে দাঁড়াল না। বসেই বলল, ''আপনাদের মধ্যে নিশ্চয়ই একজন শর্বরী। আমি তানিয়া।'' নমস্কার-টমস্কারের পালা চুকলে ওরা আসল কথায় এল।

''এত দিন পর শশাঙ্ক আমার খোঁজ কেন করছে? কত যে খুঁজেছি ওকে। একেবারে ভ্যানিশ হয়ে গেল। ফোন নম্বরটাও পালটে ফেলেছিল। পরিপাটি করে বোল্ড করেছে আমাকে। পরে শুনলাম এক শাঁসালো বাপের সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করার জন্যই তার অন্তর্ধান।''

রাগিণী কথা শুরু করল, ''প্রথমেই বলে রাখি, শশাঙ্ক আপনার খোঁজে আমাদের পাঠায়নি। প্র্যাক্টিক্যালি শশাঙ্ককে আমরা চিনিই না।''

''তাহলে?'' তানিয়ার চোখ কুঁচকে গেল।

''আমার এক বন্ধুর দিদিকে বিয়ে করেছে শশাঙ্ক। তবে তারাও মধ্যবিত্ত, শাঁসালো কিছু নয়। মেয়েটি সুন্দরী এবং নিরীহ। আর এই দু'টি জিনিসের জন্য সে দায়ী নয়।'' এই পর্যন্ত বলে রাগিণী পুরো ব্যাপারটা তানিয়াকে বলে গেল।

সব শুনে তানিয়া প্রথমে একটু হাসল, বলল, ''এই খাঁচাটার সামনে কেন আসতে বললাম বলুন তো?''

''কেন?''

''এই লাল বেঞ্চিটায় আমি আর শশাঙ্ক বসতাম। খাঁচাটায় তখন অনেকগুলো পাখি ছিল। ওদের দুরন্তপনায় ভরা কলকাকলি শুনতে খুব ভাল লাগত আমার। একদিন সব ক'টা পাখি পালিয়ে গেল। শুধু একটা পাখি পড়ে রইল। সে কি পালাতে পারল না, না পালাল না বুঝতে পারলাম না। তারপর একদিন শশাঙ্ক হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিল। সব যোগাযোগ ছিন্ন। যে বাড়িটায় থাকত সেখান থেকেও চলে গেল। তাও আমি বিকেলে একা-একা এই পার্কে আসতাম। এই বেঞ্চিটায় বসতাম। কেন জানেন? পাখিটার জন্য।''

''পাখিটার জন্য? কেন?'' রাগিণী বলে উঠল।

''পাখিটার সঙ্গে বড় একাত্মবোধ করতাম। ও উদাস হয়ে বসে থাকত, আমিও। তারপর একদিন আমি ভয় পেয়ে আসা বন্ধ করে দিলাম। ভয় কেন বলুন তো? মনে হল একদিন যদি এসে দেখি ওই পাখিটাও চলে গেছে? তার চেয়ে আমিই আসা বন্ধ করে দিই। কল্পনায় ও থেকে যাবে আমার কাছে।''

''তাহলে আপনি শশাঙ্কর প্রতি আর অনুরক্ত নন?''

''অনুরক্ত থাকব, কেন? আমাকে ধোঁকা দিয়ে অন্য আর এক জায়গায় বিয়ে করেছে সে। আমাকে কি এতটাই সস্তা মনে হচ্ছে আপনাদের? আর আপনারা আজ এত দিন পরে আমার কাছেই বা কেন এলেন?''

''একটা কথা বলতে, দিদির উপর যে অত্যাচারটা হচ্ছে আমরা সেটা বন্ধ করতে চাই। যদি সে কখনও আপনাকে ফোন করে, তাহলে আপনি শুধু একটা কথাই বলবেন— ''আমি তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলতে চাই না।''

''বেশ, সে আমি এমনিতেই তাই বলতাম। আমি আপনাদেরও বলছি, আমাকে টানাটানি করবেন না। এত দিন পর আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে বাড়ি থেকে।''

''আমিও সেইরকমই একটা অনুমান করেছিলাম। কিছুতেই দেখা করতে রাজি হচ্ছিলেন না। না, আপনি সুখে থাকুন। আর দেখা করতে চাইব না।'' রাগিণী তানিয়াকে আশ্বস্ত করল।

শর্বরী শুধু মিনতির সুরে বলল, ''আপনাদের মধ্যে কোনও কোড নেম কিছু ছিল? যদি বলতে আপত্তি থাকে, তাহলে বলতে হবে না।''

একটু চুপ করে রইল তানিয়া। তারপর বলল, ''এত কিছু বললাম, ওটা বললে আর কিসের ক্ষতি? আমি ওকে মাঝে মাঝে শশী বলে ডাকতাম আর ও আমাকে তখন শশিকলা বলে খেপাত।''

''ব্যস, ব্যস, ওতেই হবে। অনেক সাহায্য করলেন।'' শর্বরী তানিয়ার হাতে হাত রাখল।

''চলি তাহলে। আপনাদের দিদির জীবনে সুখ ফিরে আসুক। এক সময় ওই মেয়ের মরণ কামনা করেছিলাম। আজ তার সুখ কামনা করছি। তবে শশাঙ্ককে একটু জব্দ করতে পারলে আমার ভালই লাগবে।

মানুষ সম্পূর্ণ অপরিচিতের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করে তানিয়া সেরকমই করল। দেখা করতে রাজি হল না।

যদিও আজ আর কোনও অনুভূতি নেই ওর জন্য, তবে একদিন তো ছিল।''

কিশোরকে তৃপ্তি মন খুলে যত্ন করল আজ।

বিয়ের পর থেকে বাপেরবাড়ির কাউকে সে এতখানি সম্মান পেতে দেখেনি এই বাড়িতে। গোবর্ধন গাঙ্গুলি যে বেশ ঘোড়েল লোক, বিয়ের পর পরই বুঝে গিয়েছিল তৃপ্তি। বাপের বাড়ির লোকের সঙ্গে ফোনেও সে বেশি কথা বলতে পারত না। আজ তো শ্বশুর বেশ ভালই সময় দিচ্ছে পুত্রের শ্যালককে।

খেতে-খেতে গল্প করছে ওরা। সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে ভাল দেখায় না।

শ্বশুরমশাই একবার বললেনও সে কথা, ''ঠিক আছে বউমা, কিছু লাগলে চাইব। তুমি এখন যাও।'' তৃপ্তি চলে যাওয়ার পর গোবর্ধন গাঙ্গুলি ট্যারা চোখে বলল, ''কিশোর, আমার কয়েকটা কথার উত্তর দেবে?''

মাছের কাঁটা বাছতে-বাছতে কিশোর বলল, ''জিজ্ঞাসা করুন।''

''তুমি আমার অফিসের ব্যাপারটা কতখানি জান?''

''সবটাই। শেষ পর্যন্ত। ওরা এখনও অনেক টাকা পায়, তাই না?''

মাছ ভাত শেষ করে কিশোর দই-মিষ্টির বাটিটা টেনে নিল।

গোবর্ধন গাঙ্গুলি চোখ সরু করে বলল, ''তোমার দিদিকে সত্যিই তুমি কিছু বলোনি?''

''দিদির দিব্যি, এখনও কিছু বলিনি। বউমার কাছে আপনার ইজ্জৎ ঢিলে করে কী লাভ? প্র্যাক্টিক্যালি কাউকেই এখনও বলিনি। আপনি সোজা পথে চললে, বলবও না।''

খ্যাঁকশিয়ালের মতো করে হেসে উঠল গোবর্ধন, ''ওই যে দইটা খাচ্ছ, যেটা আমি ছুঁইনি। ওই দইটায় যদি বিষ মেশানো থাকে? তোমার সঙ্গে-সঙ্গে আমার অপকীর্তির গল্পোও ফিনিশ।''

দইয়ের বাটিটা চাটতে-চাটতে কিশোর বলল, ''কাউকে বলিনি বলেছি, জানাইনি তা তো বলিনি।''

''মানে? তার মানে কী?''

''সব কথা লিখে, প্রমাণ দিয়ে, একটা খামের মধ্যে ভরে, এক বন্ধুর কাছে রেখে দিয়েছি। প্ল্যানটা সেই বন্ধুরই। ও-ই বলল, তোর দিদির শ্বশুরটা যা লোভী আর কুচুটে! তোর যদি কোনও ক্ষতি করে তো তাকে দেখে নেব।''

চোখ টানটান করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল গোবর্ধন এক মিনিট। তারপর হো-হো করে হেসে উঠল, ''তুমি ভাবতে পারলে, আমি তোমাকে বিষ খাওয়াব! আমার বউমার একমাত্র ছোট ভাই বলে কথা।''

কিশোর বেসিনে হাত ধুতে-ধুতে আরও জোরে হেসে উঠল, ''সে কী আমি জানি না, আপনার মনটা কী উদার আর সরল।''

তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'মনে রাখবেন, দিদি কষ্ট পেলে আমি যা খুশি করে ফেলতে পারি। আর শুনুন, ছেলেকে একটু শাসন-টাসন করবেন।''

কিশোর চলেই আসছিল, এই সময় শশাঙ্ক বাড়ি ঢুকল। কিশোরকে দেখে সে মোটেই খুশি হল না। বলেই ফেলল, ''তুমি শালা, এখানে কী মনে করে?''

গোবর্ধন গাঙ্গুলি গর্জন করে উঠল, ''এ-ই, ওটা কি কুটুমের সঙ্গে কথা বলার রীতি? বউমা কষ্ট পায় এইরকম তুই কিছু করলে

আমি তোর ঠ্যাং ভেঙে দেব।''
শশাঙ্ক অবাক! আজ তার দিনটাই খারাপ। বাবা ধমকাচ্ছে বাইরের লোকের সামনে। তানিয়া আজ অফিসে ফোন করে প্রচুর ধমকেছে। কী করে ওর অফিসের ফোন নম্বর পেল কে জানে? সেই লাজুক মেয়েটা যেন ফুলনদেবী হয়ে গিয়েছে! প্রথমে তো বিশ্বাসই হয়নি শশাঙ্কর। ওভাবে তানিয়া কথাই বলত না। শাসানো তো দূরের কথা! আবার বলে কি না, এবার একদিন বাড়ি গিয়ে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে আসব।
শশাঙ্ক বেকায়দা বুঝে বলেছিল, ''তুমি কি আমাকে ব্ল্যাকমেল করবে? কত টাকা চাই তোমার? বাড়ি আসতে হবে না।!' সঙ্গে-সঙ্গে সেই মেয়ে বলে উঠল, ''চুপ। আমার বরের এখন অনেক টাকা, তুই কী টাকা দেখাচ্ছিস আমাকে?''
''তানিয়া, তুমি আমার সঙ্গে এত রূঢ়ভাবে কথা বলছ সেটা বিশ্বাসই হচ্ছে না।''
''তবে কি তোমাকে এখনও শশী-শশী বলে ডাকব? মনে রেখো, আমিও আর তোমার সেই শশিকলা নই।''
তখন শশাঙ্ক চমকে উঠেছিল। তানিয়াই এ। নিশ্চিত তানিয়া। মনের মধ্যে ঝড় নিয়ে বাড়ি ফিরে এসে সামনেই শালাকে দেখে চটে চৌষট্টি হয়ে উঠেছিল। এমন সময় বাবার কাছ থেকে অকারণ ও অনিয়মের একখানা বড়-সড় ঝাড় খেতে হল!

কিশোর চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ। তৃপ্তি শাশুড়িকে খাইয়ে এলো। সে কারও সঙ্গে খায় না, একা খায়। এবার নত হয়ে জিজ্ঞাসা করল শ্বশুর ও স্বামীকে, ''আপনাদের খাবার কি বেড়ে দেব?''
এরকমই নিয়ম এখানে, শ্বশুর আর স্বামীর খাওয়া হয়ে গেলে সকলের শেষে তৃপ্তি একাই খায়। তারপর তার অনেক কাজ। গোবর্ধন আজ অন্যরকম গলায় বলল, ''কেন বউমা, আজ তোমরা একসঙ্গে খেতে বসো। আমি তো কিশোরের সঙ্গেই খেয়ে নিয়েছি।'' তৃপ্তি মনে-মনে খুশি হল। শশাঙ্ক হাসি মুখে বলল, ''তৃপ্তি, কয়েক দিন বাপের বাড়ি গিয়ে থেকে আসতে পারো ইচ্ছে হলে। কিশোরকে বলে দিলেই হত, থাক, আমি নিজে গিয়েই দিয়ে আসব।''
তৃপ্তি মনে-মনে হড়কে যাচ্ছিল, বিনা তৈলমর্দনে বাপের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি? তাও বাপ-ছেলেতে শলা-পরামর্শ ছাড়াই! গোবর্ধন আজ অসম্ভব উদার। ভূতে পাওয়ার মতোই আজ তাকে পিতৃস্নেহ পেয়েছে। আকর্ণ হেসে বলল, ''বাপের বাড়ি কেন? বিয়ের পর তো তোরা কোথাও হনিমুনে যাসনি। যা না, বউমাকে নিয়ে কোথাও একটু ঘুরে আয়।''
তৃপ্তির মাথা ঘুরছে। এটা তার পক্ষে সত্যিই বাড়াবাড়ি। কিশোরের নেমন্তন্ন পর্যন্ত তবু সহ্য হয়েছে। কিন্তু এখন কী হচ্ছে এই ঘরে? ভূমিকম্প!

৭

ঝটিকা বাহিনীর এই কেসটাও সাকসেসফুল হল!
গোবর্ধনের মেজাজ এখন পুরো গোবর! বউমাকে বিরক্ত করাও আপাতত বন্ধ। তাই বলে কিশোর তাকে কখনও অসম্মান করে না। পুজোর তত্ত্ব-তালাশও করবে ঠিক করেছে। তৃপ্তি মাঝে-মাঝে বাপের বাড়ি আসে। হাসিমুখেই আছে। ওরা কয়েক দিনের জন্য পুরী ঘুরে এল।

তানিয়া আর একদিন ফোন করেছিল শশাঙ্ককে, ''কী, একদিন তোমার অফিসে যাব নাকি?''
''আমাকে তুমি রেহাই দাও। এখন আমি বিবাহিত। তুমিও নিশ্চয়ই তাই। তবে

পুরনো ঘটনার জের টানছ কেন?''
''তোমাকে একটু শাস্তি দিতে ইচ্ছে করে। তোমার বাড়ি গিয়ে তোমার স্ত্রী'কে বলে আসব সব? জানো তো, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করলে সেটা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ?''
''হ্যাঁ, আমি বিয়ে করব বলেছিলাম কিন্তু ওই সব করেছি নাকি?''
''করনি। তবে বানিয়ে বলে দিতে কী অসুবিধা?''
''সে কী! তোমার তো এত সাহস ছিল না!''
''আমার কয়েকজন বন্ধু জুটেছে। তারাই সাহস-টাহস জোগাচ্ছে। যাব একদিন তোমার বাড়ি?''
''না-না, আমি কয়েক দিনের জন্য কলকাতার বাইরে যাচ্ছি।''
''তার আগেই ঘুরে আসি?''
শশাঙ্ক খুব ভীত হয়ে ফোনটা ছেড়ে দিল। আর তার পরেই পুরী বেড়াতে চলে গেল।

কিশোর দিদির সমস্যা দূর করল কিন্তু নিজে একটা ঝামেলায় জড়িয়ে গেল। জড়িয়ে গেল মানে ও একটা কেরিয়ার গাইডেন্স সেন্টারের ফ্রন্ট অফিসে কাজ করে। ওর ডিউটি ফ্রন্ট অফিসে কিন্তু ঠিক রিসেপশনিস্ট নয়। যারা গাইডেন্সের জন্য আসে তাদের কনভিন্স করা, প্রাথমিক কথাবার্তা বলা এ সবই ওর কাজ। কিছুটা পুরনো হয়ে যাওয়ার পর এখন টাকাপয়সা নেওয়ার কাজটাও করে। কয়েকদিন ধরে 'গোবর্ধন অ্যান্ড কোং' সামলাতে অনেক ছুটি নিয়ে ফেলেছে কিশোর। বস রেগে কাঁই। দরজা দেখিয়ে দেয় আর কী! কিশোর অনেক সাধ্য-সাধনা করে, বাবার অসুখ, দিদির অসুখ, এসব একশো একাশিরকম ভুজুং ভাজুং দিয়ে সামলেছে। ও রাগিণীকে বলে ফেলতে বাধ্য হল, ''রাগিণীদি, তোমাদের বাহিনীতে আমি আছি। কিন্তু কয়েক দিন আমাকে ডেকো না। নতুন কেস এলেও না। বেকারের ভাত নেই। তারপর আবার পরোপকার। এখানে ল্যাং খেয়ে গেলে ধনে-প্রাণে মরব।''
''আচ্ছা, এখন তোকে ডাকব না। খুব দরকার না হলে নয়।''
''আমাকে ভুল বুঝো না, প্লিজ।''
''ঠিক আছে। তুই অফিসটা সামলে নে।''

কপিলের সঙ্গে শর্বরীর বেশ একটা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান হয়ে গেছে। অনেক প্রমিস করেছে কপিল। জীবনে সে এমন কিছু করবে না যাতে শর্বরী দুঃখ পায়। নিজেই অফিস থেকে একজন কাজের লোক নিয়ে এসেছে। সে সকালে আসে রাতে যায়। সব কাজ করে। একটু বয়স্ক। শর্বরী তাকে দাদাই বলে। কাজের লোক, তাতে কী, দাদা বললে দোষ নেই। হারুদা। লোকটিও বেশ ভাল। কপিলের মা'কে সে গিন্নিমা বলে। শর্বরীকে বউদি বলাটাই স্বাভাবিক কিন্তু সে 'মালকিন' বলে। প্রথম প্রথম শর্বরীর ওই ডাকে অস্বস্তি হত, এখন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। বিশেষত শর্বরী লক্ষ করল মহিলা কাজের লোকের থেকে ছেলে কাজের লোক অনেক সুবিধাজনক। সে কখনও গৃহস্থালির অন্দরমহলে প্রবেশ করে না। তাছাড়া, শর্বরীর কসমেটিক্স ইত্যাদির দিকে নজর নেই। সাজ-পোশাক টেরিয়ে দেখে না। ঈর্ষার তো প্রশ্নই আসে না। খুব সহজ বোধ করে শর্বরী। গাল-গল্প তো করেই না হারুদা, একস্ট্রা কথাও বলে না। আগের মহিলাকর্মী সব কথায় ফোড়ন কাটত। শাশুড়ি-বউয়ে মনোমালিন্য, তার মধ্যে ফোড়ন। দাম্পত্য কলহ হচ্ছে, তার মধ্যে ফোড়ন। খুব বিরক্তিকর লাগত ব্যাপারটা। হারুদা ও সবের মধ্যে নেই।
বাড়ির পরিবেশটাও সহজ হয়ে গেছে। কপিলকে পাহারা দিতে হয় না। উলটে কপিল দু-এক দিনের জন্য কলকাতার বাইরে গেলে হারুদা এ বাড়িতে থেকে যায়। প্রথম যেবার কপিল টুরে গেল সেবার শর্বরীর মাথায় হাতুড়ি পড়েছিল। স্বামীর দুর্বল চরিত্রের খবর সে রাখে। রাগিণী লোকটাকে সোজা করে দিয়ে গিয়েছে। কিন্তু বাইরে গিয়ে যদি কিছু করে?
কপিল বলেছিল, ''আমাকে বিশ্বাস করো। কিচ্ছু এদিক-ওদিক করব না। আমি বলেছি তোমাকে, যা দোষ আমার ছিল, সংশোধন হয়ে গিয়েছে।''
তবু শর্বরীর মন মানছিল না। মগজে একবার অবিশ্বাসের পোকা ঢুকে গেলে তাকে উৎখাত করা মুশকিল। শর্বরীর মুখ হাঁড়ি হয়ে রইল, যাওয়ার আগের দিন পর্যন্ত।
শেষ পর্যন্ত কপিল বলল, ''ঠিক আছে, তোমার নামে শপথ নিয়ে প্রতিজ্ঞা করছি। আমি...।''
''চুপ করো। আমার নামে শপথ? জানি না, ভাগ্যবানের বউ মরে?''
''ও কী সেকেলে কথাবার্তা! বেশ মায়ের নামে শপথ নিয়ে বলছি।''
শর্বরীর চোখ মুখ একটু উজ্জ্বল দেখাল বোধহয়।
এইভাবেই শর্বরী 'স্বামী সোহাগিনী' না হয়ে থাকলেও 'শান্তি প্রবাহিনী' হয়ে বাস করতে লাগল।
মানুষটা যে তাকে ভালবাসে না তা নয়। অসুস্থ শর্বরীর মাথার কাছে বসে রাতেও জাগে। শর্বরী কী ভালবাসে না ভালবাসে তার খেয়ালও রাখে। যথেষ্ট উদার। নিজে শর্বরী মায়ের জন্য মাঝারি দামের শাড়ি-টাড়ি কিনলেও কপিল সব সময় নিজের মায়ের জন্য যা কেনে শর্বরীর মায়ের জন্যও তাই কেনে।
সবই ঠিক আছে কিন্তু ওই একটা ব্যাপারে কপিলকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না শর্বরী। আপ্রাণ চেষ্টা করে মানিয়ে নিতে। বিশ্বাস করে, কপিলের ওই অসুখ সেরে গিয়েছে। বিশ্বাস করে খুশি থাকতে চায়।

রাগিণী একদিন পটকার খবর নেওয়ার জন্য সুহাসিনীর বাড়িতে ফোন করল। ফোনটা মলয় ধরল। মলয়ের সঙ্গে রাগিণীদের খুব বেশি কথাবার্তা হয়নি আগে। তবু আলাপ তো হয়েছিলই, তাই রাগিণী বলল, ''আমি রাগিণী কথা বলছি, আমাকে আপনার হয়তো মনে নেই। আমি পটকা কেমন আছে জানতে ফোন করেছিলাম। আপনি আপনার মা'কে একটু দেবেন?''
''আমি আপনাকে চিনতে পারব না? কেন? আপনারা তো মশাই আমাদের পরিবারের সেভিয়ার। মুকুলের গড়বড়ে মেশিনটা প্রথমে ঠিক করে দিলেন। তারপর সংসারটা যখন ডুবুডুবু তখন পটকাকে এনে দিলেন। ইউ আর ফ্যান্টাস্টিক টু।'' মলয়ের কথায় রাগিণী হেসে ফেলল, ''তার মানে পটকা ওখানে ভালই আছে।''
''পটকা কতটা ভাল আছে সে পটকাই বলবে কিন্তু পটকার জন্য আমরা সবাই ভাল আছি এটুকু বলতে পারি।''
''ব্যস-ব্যস, ওতেই হবে। আমার এটুকুই জানার ছিল। ছাড়ছি।''
''কেন? পটকার সঙ্গে কথা বলবেন না?''
''পটকার সঙ্গে কথা বলা যাবে?''
''যাবে না কেন? এই পটকা, এদিকে আয়। তোর রাগিণীদির ফোন।''
পটকা মনে হয় কিছু কাজ করছিল, ছুটে এসে ফোন ধরল, ''হ্যালো, তুমি কে?''
''আমি রাগিণীদিদি। কেমন আছ পটকা? ভাল লাগছে ওখানে?''
''হ্যাঁ রাগিণীদিদি, আমি স্কুলে ভর্তি হয়েছি জানো তো। শর্বরীদি তো সব বই কিনে দিয়ে গেছে। আমি যদি এবার পাশ করি, ফাইভে উঠব। স্কুলে বলেছে। তোমরা কবে আসবে? তোমরা দু'জনে একদিন এলে খুব ভাল হয়।''
''যাব পটকা। নিশ্চয়ই যাব।''
'' একটা দরকারি কথা আছে তোমাদের সঙ্গে।''

"ওখানে সব ঠিক আছে? টাকা-পয়সা লাগবে?"
"সব ঠিক আছে। মলয়দাদাবাবু আমাকে কিছু-কিছু টাকা-পয়সা সব সময় দেন। আমি নিতে চাইতাম না, বলেছিলাম, মাইনে লাগবে না এই শর্তেই দিদিরা দিয়ে গিয়েছে। দাদাবাবু বললেন, "এটা তো মাইনে নয়, এটা টিপস।" কথা শেষ করে পটকা হেসে উঠল।
রাগিণীও হেসে উঠল।
ফোন ছেড়ে রাগিণী মনে-মনে ভাবল মলয়বাবুর কাছ থেকে একটা ভাল জিনিস শেখা গেল। সত্যিই তো, বাড়ির কাজের লোককে আমরা মাইনেটাই দিই। ভাল কাজের জন্য টিপস তো দিই না। কিন্তু দেওয়া উচিত।

কিশোর নিজের অফিসে আবার নিজস্ব জায়গায় ফিরে গিয়েছে। সে প্রত্যেক দিন ওভার টাইম করে কিন্তু তার জন্য কোনও রেমুনারেশন নেয় না। বস একদিন ডেকে বলেছে "এভাবে আমাদের অপদস্থ করার মানে কী?"
"অপদস্থ? কী বলছেন স্যর! যত দিন না আমার অনুপস্থিতিতে আপনাদের ক্ষতি উসুল হয়ে যায় তত দিন আমি এভাবে বিনা পারিশ্রমিকে ওভার টাইম করে যাব।"
অবশেষে বস একদিন ডেকে বলেছে, "সব ক্ষতি-টতি পুষিয়ে গিয়েছে ভাই। তুমি এবার থামো। তোমাকে স্পেশাল একটা প্রমোশন দেওয়া হবে।"
"রিয়্যালি? কীরকম?"
"তোমাকে ফ্রন্ট হাউস থেকে সরিয়ে মেন হাউসে আনা হবে। স্যালারিও বাড়বে।"
"আর ছুটি?"
"সপ্তাহে একদিন, আগে যেমন ছিল। কিন্তু একটা ফেসিলিটি হল এই যে, তোমাকে বছরে দশটা ছুটি দেওয়া হবে। তুমি টানাও নিতে পারো, কেটে কেটেও নিতে পারো।"
কিশোর এমন কিছু খুশি হল না। সে শুকনো হেসে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলল কেবল।
"তোমাকে অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে রাখলাম, ঠিক আছে?" মাথা নাড়ল কিশোর। কিন্তু হাসল না।
বস গম্ভীরভাবে বলল, "আর একটা ব্যাপার", এইটুকু বলে চুপ করে থাকল সে। কিশোর দমবন্ধ করে চেয়ে আছে, বস বলে উঠল, "তোমাকে পার্মানেন্ট করা হল।"
"ও, থ্যাঙ্ক ইউ স্যর।" এইবার কিশোর খুশি হয়ে উঠে দাঁড়াল।
সবাই হাসছিল। কিশোরকে অফিসে সবাই ভালবাসে। কারণ কাজটা সে মন দিয়েই করে। উপরন্তু কারও কোনও অসুবিধা হলে, নিজেই এগিয়ে গিয়ে সাহায্য করে তাকে।
কিশোর রাগিণীকে খবরটা দিল।
শর্বরীকেও। দু'জনেই খুশি হল।
"এবার রাগিণীদি তোমরা আমাকে ডাকতে পারো। আমি বাহিনীতে আছি। যে কোনও কাজে লাগতে পারি।"
"এই মুহূর্তে কোনও কাজ নেই। দরকার হলে ডাকব তোকে।" রাগিণী জানাল।

রাগিণী আর শর্বরী দু'জনে মিলে পটকাকে দেখতে চলল এক রবিবার সকালে। পটকা খুশি। খুশি সুহাসিনীও। মুকুলও একবার হাসিমুখ দেখিয়ে গেল। পটকা ওদের লুচি আর ঘুগনি খেতে দিল যত্ন করে।
সুহাসিনী বলল, "মুকুলের হাসিমুখ দেখতে পেলে কেন বলতো? এই ঘুগনি পটকা বানিয়েছে। লুচিও প্রায় সবটাই ওর করা। আমি শুধু ভেজেছি। অত বড় তেলের কড়াইয়ের সামনে পটকাকে দাঁড়াতে দিই না।"
শর্বরী হাসল। তাদের বাড়ির হারুদাও ভাল ঘুগনি বানায়।
মুকুলকে নাকি পটকা খুব সার্ভিস দেয়। কীভাবে-কীভাবে, সে কথা শুনে ওরা খুব হাসছিল।
"আর পড়াশোনা? তার কী খবর?" শর্বরীর জিজ্ঞাসার উত্তরে সুহাসিনী বলল, "পটকা, সেটাও দেখিয়ে দে। আর বলে দে কে পড়ায়।"
"আমাকে মা পড়ায় রোজ সন্ধেবেলা। কোনও ছুটি নেই।"
"মা?" রাগিণী অবাক হল।
হ্যাঁ, সুহাসিনীকে পটকা মা বলে। কারণ দাদার মা'কে তো মা-ই বলতে হয়, নাকি? মলয় যদি 'দাদা' হয়, মুকুলিকা 'বউদি' তাহলে সুহাসিনী তো 'মা'-ই হবে।
"একদিনও নন্দিনীর সঙ্গে দেখা হল না।" শর্বরী উঠতে-উঠতে বলল।
"সে পড়তে গিয়েছে।" সুহাসিনী পটকাকে শর্বরীদের কাছে রেখে উঠে গেলেন। পটকার নিজস্ব কোনও কথা থাকতে পারে এদের সঙ্গে।
রাগিণী বলল, "পটকা দেখা করতে চেয়েছিলিস কেন?"
"এদের সম্বন্ধে তোর কি আলাদা করে কিছু বলার আছে?" শর্বরী জিজ্ঞাসা করল।
"এদের সম্বন্ধে নয় শর্বরীদি। আমি অন্য একটা কথা বলবার জন্য তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম। আমি তো এখানে ভালই আছি। কিন্তু আমি একবার আমার পিসির সঙ্গে দেখা করতে চাই।"
"তোর পিসি? কই, তোর যে একজন পিসি আছে বলিসনি তো। তাহলে তার কাছেই আগে নিয়ে যেতাম।"
"সেভাবে বলার মতো নয় বলেই বলিনি। পিসি আমাকে ভালবাসে কিন্তু পিসেমশাই আমাকে সহ্য করতে পারে না। একবার দু'দিনের জন্য গিয়েছিলাম। আমাকে বলতে গেলে মেরেই তাড়িয়ে দিয়েছে। পিসিও বলেছিল, আর আসিস না পটকা। নিজে একটা কিছু করতে না পারা পর্যন্ত পিসিকে ভুলেই থাকিস।"
"কোথায় থাকে তোর পিসি?"
"নারকেলডাঙায়। আমার কাছে পিসির ঠিকানা আছে। শিয়ালদা পর্যন্ত নিয়ে গেলে আমি চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারব। নিয়ে যাবে আমাকে রাগিণীদি, শর্বরীদি?"
রাগিণী চুপ করেছিল। শর্বরী বলল, "আচ্ছা নিয়ে যাব। কবে যাবি বল, সামনের রবিবার যাবি, এই বেলা এগারোটা নাগাদ?"
"না-না, রবিবার আমি কিছুতেই যাব না। রবিবার পিসের ছুটি, যদি বাড়ি থাকে? তার চেয়ে আমরা বরং এমনি দিনে যাব। তোমাদের যখন সুবিধা হবে।"
"কী করে তোর পিসেমশাই?"
"একটা লেদের কারখানায় কাজ করে। ভাল লোক না, মদ খায়। পিসিকে বোধহয় মারেও, যা হম্বি-তম্বি করে! পিসি তো পিসি, পিসির শাশুড়িও ভয় খায়। সে ছেলের থেকে ছেলের বউকে বেশি ভালবাসে কিন্তু সামনে কিছু বলতে সাহস পায় না।"
"তো আমাদের কী ভয়? যাবই যখন পিসেমানিককেও একবার দেখে আসব।"
"না-না, তার দরকার নেই। আমরা কিছুক্ষণ থেকে চলে আসব। পিসের মুখোমুখি হওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই আমার। এখানে কাজ করি সে কথা বলারও দরকার নেই। মায়ের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে একদিন বেড়িয়ে আসব।"
"ঠিক আছে। একদিন আমরা সময় করে নিয়ে যাব। ফোন করে জানিয়ে দেব আগে, তুই মাসিমার কাছ থেকে ছুটি চেয়ে রাখবি।" এই বলে শর্বরী উঠে দাঁড়াল। পটকা এগিয়ে দিল ওদের দরজা পর্যন্ত।

৮

ট্রাঙ্গুলার পার্কের কোণে একটা ছোট রেস্তোরাঁ আছে, রাগিণী আর অংশুর প্রিয় দোকান। জায়গাটা ওদের কাছে নস্টালজিক। যখন দু'জনের কেউ-ই দাঁড়ায়নি, কেবল স্বপ্নমাখা চোখ, তখন এখানে আসত। আর দিনের পর দিন গল্প

করত। জীবনের একটা বিশেষ অংশ আর সবচেয়ে মূল্যবান প্রতিশ্রুতিগুলো এই দোকানেই দেওয়া নেওয়া হয়েছে।
তাই আজও মাঝে-মাঝে এখানেই ওরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়। এসে বসে। না হলে ওরা যা চাকরি করে, যেভাবে জীবন গুছিয়ে নিয়েছে , তাতে অনেক বড় জায়গাতেই ওরা খেতে যেতে পারে। আড্ডা মারতে পারে, তবু ওরা এখানেই আসে।
অংশুমান খুব সাদাসিধে মনের ছেলে। ওর জীবনের কিছুই গোপন নেই রাগিণীর কাছে। চাকরির ছোট-ছোট সমস্যাগুলো অনায়াসে রাগিণীর সঙ্গে আলোচনা করে। কিন্তু রাগিণী একেডি সংক্রান্ত সব কথা অংশুমানের কাছে গোপন করে গিয়েছে। শর্বরীর বিবাহিত জীবনের কথা কিচ্ছু বলেনি। বলেনি কপিলকে জব্দ করার কথাও।
এমনি শর্বরীর কথা বলেছে, একদিন ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে, সে কথাও বলেছে। কিন্তু ভিতরের কথা কিচ্ছু বলেনি। দু'জনে মিলে কী কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে, সবই চেপে গেছে। কিশোর, তার দিদি, পটকা, সুহাসিনী, ঝটিকা বাহিনীর কোনও কেসের কথা ভুলেও উত্থাপন করেনি। রাগিণীর মধ্যে একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। আর সেটা খুব পাওয়ারফুল। সেই সচেতন মনটাই বলে দিয়েছে ওদের ঝটিকা বাহিনীর সফরসূচি অন্তরালে রাখাই নিরাপদ।
হয়তো অংশুমান সব শুনে খুশিই হত। ওদের কাজগুলোকে প্রশংসার চোখেই দেখত। কিন্তু রাগিণীরা বাহবা চায় না। তাই অভিযানগুলো গোপনই রাখতে চায়। আজও রাগিণী বলল না কাল শর্বরীর বাড়ি যেতে পারে।
শর্বরীর শাশুড়ি দু'দিনের জন্য কোথাও গেছে। কপিলও এখন অফিস থেকে আসতে দেরি করে। তাই শর্বরী রাগিণীকে বাড়িতে ডেকেছে।
অনেক দিন পর দুই বন্ধু নিবিড় হয়ে গল্প করছিল।
"জানিস রাগিণী, কপিল একেবারে পালটে গিয়েছে। তুই যে ওকে কোন ধ্যানে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলি জানি না, সে ধ্যানেই কপিলমুনি শুদ্ধ হয়ে গেছে। দেখ না, নিজেই তো কাজের লোক হিসেবে হারুদাকে নিযুক্ত করেছে। ও বলেছে মেডসারভেন্ট আর রাখবেই না কোনও দিন। কেন যে ওরকম করত ওদের সঙ্গে কে জানে?"
"ভালই তো শর্বরী, কপিলের যে চৈতন্য হয়েছে, সেটা তো আনন্দেরই কথা।"
"আমাকে ও সত্যিই খুব ভালবাসেরে। এই তো, দেখ না, আমার পেটে ব্যথার জন্য কাল সারারাত ঘুমোতে পারিনি। ও-ও ঘুমোয়নি। আমার মাথার কাছে বসে ছিল ঠায়। পেটে হাত বুলিয়ে দিয়েছে, জল গরম করে সেঁক দিল, ওষুধের বাক্স খুঁজে ওষুধ দিল দু'বার। একেবারে ছটফট করে বেড়াচ্ছে সারা ঘর।"
"আমার খুব ভাল লাগছে শর্বরী। কপিলের সঙ্গে তোর ভিতরের সম্পর্কটা আবার ঠিক হয়ে গেছে, এটা আনন্দের কথা।"
শর্বরী রাগিণীর আনা চাইনিজ় খাবার বেশ তৃপ্তি করে খাচ্ছিল। ওর পেটব্যথা হয়েছিল শুনে রাগিণী বলেছিল, 'তোর পেট খারাপ জানতাম না তাই এগুলো এনেছি। থাক, তুই খাস না তাহলে। চল হারুদার বানানো খাবারই খাই আমরা।'
"আরে, সেই পেট খারাপ নয়। নো পৈটিক গোলযোগ। ওটা মনে হচ্ছে অ্যাপেন্ডিসাইটিসের ব্যথা। মাটন কষা-ফষা খেতে বারণ করেছে। আর চাইনিজ় তো কোনও মশলাই থাকে না, শুধু সস।"
শর্বরী হাসতে হাসতে বলল। রাগিণী তো জানে শর্বরী কীরকম চাইনিজ় ফুড ভালবাসে। ও-ও হেসে ফেলল।
"তাছাড়া শর্বরী, এই দোকানটা নাকি আজিনামোতো ব্যবহার করা বন্ধ করে দিয়েছে। আজও তো আমি জিজ্ঞাসা করলাম।"
"ঠিক আছে বাবা। অত স্বাস্থ্য সচেতন নই আমি। একদিন-আধদিন খাওয়াই যায়।"
রাগিণী শর্বরীর দিকে তাকাল। ওকে একটু রোগা দেখাচ্ছে। খুব বেশি খাটা-খাটনি করছে, নাকি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছে শর্বরী? আজ তো বাড়িতে কেউ নেই। কেন নেই? শর্বরীর যদি সত্যিই শরীর খারাপ হয়ে থাকে তাহলে একজন কারও থাকা উচিত ছিল।
"শর্বরী, তোদের হারুদার তো দেখা পেলাম না আজ।"
"ওর বাড়িতে একটু দরকার আছে। এমনিতে রাত আট'টার আগে কখনও যায় না। আজই ছুটি নিয়ে চলে গেল ছ'টায়। আমিও ভাবলাম, ভালই হল। সারা সন্ধেটা তুই আর আমি বেশ কাটাব।"
"তুই সত্যিই ভাল আছিস শর্বরী? আমার কাছে কিছু গোপন করছিস না?"
"নট অ্যাট অল। এই তো দেখ না, আমার শরীর খারাপ থাকলে কপিল নিজেই মাইক্রোতে সব খাবার গরম করবে ডিনারের সময়। মাঝে-মাঝে মনে হয় মতিয়া, নির্মলা, ঝুমঝুমি এদের ব্যাপারে আমারই কোনও বোঝার ভুল ছিল না তো? আর তুই তো কিছুতেই বললি না ও তোর সঙ্গে কী করেছিল। কী ভাবে তুই ওকে জব্দ করলি?"
রাগিণী ভিতরে-ভিতরে খুব সাবধান হল। কপিলকে আসলে শর্বরী খুব ভালবাসে। আর নিজের মধ্যেই তার কল্পিত যুক্তি তৈরি করে। কোনও ভাবেই এই ইলিউশন ভাঙা চলবে না। শুধু-শুধু কষ্ট পাবে মেয়েটা। তাছাড়া সত্যিই হয়তো এখন কপিল নিজেকে পালটে নিয়েছে।
রাগিণী বলল, "শোন, আমার সঙ্গে সেরকম কিচ্ছু করেনি। কোনও অভদ্রতা-অসভ্যতা নয়। আমি নিজেই ওকে একটু শুধরে দিয়েছিলাম, যাতে কোনও কাজের মেয়েদের সঙ্গে কিছু আর না করে। ব্যাপারটা স্রেফ ব্যক্তিত্বের চাপ, আর কিছু না।"
আড্ডা শেষ করে রাগিণী আট'টাতেই শর্বরীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল। শর্বরী বলছিল, কপিলের আসতে-আসতে ন'টা বাজবে। তবে সাবধান হওয়াই ভাল। রাণুর সঙ্গে কপিলের আবার সাক্ষাৎ মোটেই কাম্য নয়!

কিশোর অফিসের নতুন সেকশানে এসে ভালই আছে, কিন্তু ফ্রন্ট ডেস্কে একটা অন্যরকম মজা ছিল। নতুন-নতুন ছেলেমেয়েদের কোচিংয়ের ব্যাপারে কনভিন্স করার মধ্যে একটা উদ্যম কাজ করত। ওদের দু'চোখ ভরা স্বপ্নের সঙ্গে নিজেও যেন যুক্ত হয়ে যেত। ওর মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাসও তৈরি হয়েছিল। ওর সঙ্গে কথা বলে একজন ছাত্র-ছাত্রীও ফিরে যায়নি। সবাই তো ছাত্রও নয়, অনেকে তো অফিসে কাজ করতে করতেও নানা কমপিটিটিভ পরীক্ষার জন্য কোচিং নিতে আসে।
এমনি করেই একদিন আলাপ হয়েছিল মধুরিমার সঙ্গে। মেয়েটির মধ্যে কী আছে কিশোর তার ব্যাখ্যা দিতে পারবে না, শুধু বলতে পারে একটা কিছু আছে, যা আগে কারও মধ্যে ও দেখেনি। এখানে যারাই আসে, প্রত্যেকের সঙ্গে শুধু কেজো কথাই হয়ে থাকে। মধুরিমার সঙ্গেও হয়েছিল। কিশোরের সব কথা শোনার পর মধুরিমা আস্তে-আস্তে বলেছিল, "এগুলো তো আপনাকে বলতেই হয় এভাবে না? এটাই তো আপনার কাজ। আমাদের কনভিন্স করা। হ্যাঁ, আই অ্যাম কনভিন্সড। আমি এখানে কোচিং নেব, নিশ্চয়ই নেব। কিন্তু একটা কথা বলব?"
"কী বলুন? আর কিছু জানতে চান?"
মধুরিমা একটা ঢোক গিলল, কারও ঢোক গেলার মধ্যে যে এতটা সরলতা থাকতে

পারে, আগে কখনও দেখেনি কিশোর।
মধুরিমা চোখটা স্থির করে বলল,
"নিজেকে এই সংস্থার কর্মী হিসাবে না ভেবে একটু বলুন না, সত্যিই এখান থেকে কোচিং নিলে সফল হওয়া যায়?"
কিশোর ভিতরে-ভিতরে তাজ্জব হয়ে গেল। মেয়েটা কি পাগল না বোকা!
কিশোর ওর অনুরোধ কেন শুনবে? শুনতে পারে? কিন্তু মধুরিমা এমন একটা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে যা এক্সরে-র চেয়েও ভয়ঙ্কর। মিথ্যে বলার যেন কোনও উপায়ই নেই কিশোরের। ও ফিস-ফিস করে বলল, "ফিফটি-ফিফটি চান্স। আমরা যে বলি নাইনটি ফাইভ সাফল্য, ওটা বিজ্ঞাপনের কথা।"
মধুরিমা মিষ্টি করে হাসল।
কিশোর বুঝে গেল, ওর যা ভুল করার করে ফেলেছে। মেয়েটার কাছে বিজনেস সিক্রেট ফাঁস করে দিয়েছে। চলে গেল একটা স্টুডেন্ট। তার নিজের বোকামির জন্য। কোনও মানে হয়!
মধুরিমা উঠে দাঁড়াল। তারপর ব্যাগ থেকে একগোছা টাকা বার করে ওর দিকে এগিয়ে দিল, "দিন, ফর্মটা ফিল-আপ করে দিই।"
"মানে?"
"মানে আমি এখানে ভর্তি হব, ওনলি ফর ইওর অনেস্টি। যে সংস্থায় আপনার মতো মানুষ আছে সেখানে ভরসা করা যায়।"
কিশোর আবার হোঁচট খেল।
"মনে-মনে ভাবছেন, মেয়েটা পাগল নাকি বোকা, তাই তো? আমি কোনওটাই নই। আমি মধুরিমা রায়।"
কিশোর একেবারে বোল্ড আউট। এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, সাংঘাতিক নিশ্চয়। সেই থেকে কিশোর মধুরিমার জন্য ভিতরে-ভিতরে 'উচাটন মন-প্রাণ' যাকে বলে। কিন্তু একদিনও এগিয়ে গিয়ে কথা বলেনি। বলার সাহসই হয়নি। ও মেয়ে যে কী উত্তর দেবে কে জানে? লাট্টু বানিয়ে দেবে একেবারে! একবার করে দেখা অবশ্য ওর সঙ্গে হয়, যেদিন-যেদিন আসে। সেই দিন কিশোরের অন্য জায়গায় যত কাজই থাকুক, সেন্টারে নো-অ্যাবসেন্ট।
চোখাচোখি হয়, একচিলতে হাসি বিনিময়। এক একটা মুখ আছে না? যাকে একবার দেখতে পেলে মনে হয় একটুখানি আয়ু বেড়ে গেল নিজের। বুকটা ভরে গেল বিশুদ্ধ বাতাসে! মধুরিমাকে দেখতে পেলে কিশোরের ঠিক ওইরকম অনুভূতি হয়।
কিশোর ভাবছিল, একে নিশ্চয়ই প্রেম বলে না। প্রেম তো অন্য জিনিস, ডেটিং-ফেটিং হয়, আরও কত কিছু। তাহলে এই ফিলিংসটাকে কী বলবে ও? দূর। সব অনুভূতির কি নাম হয় নাকি?
এখন ভিতরের হলে একটা কর্নার টেবিলে বসে কিশোর, প্রমোশনের পর এটাই ওর জায়গা। সেদিন নিজের টেবিলে বসে মগ্ন হয়ে একটা ফাইল দেখছিল, হঠাৎ একটা রিনরিনে স্বর ভেসে উঠল— 'কিশোর।'
মুখ তুলে কিশোর এত চমকে গেল যে হৃদপিণ্ডটা শার্টের ভিতর থেকে বাইরে লাফিয়ে পড়ে আর একটু হলে। কারও মুখে নিজের নাম শুনলে এত থ্রিলিং হয় আগে কি জানা ছিল কিশোরের?
"আপনি আমার নাম জানেন?"
মধুরিমা এমন একটা হাসি দিল যার মানে ছেলেরা ঘাবড়ে গেলে এইরকমই বোকা-বোকা কথা বলে। মুখে বলল, "আপনি প্রথম দিন আমার সঙ্গে কথা বলার সময় প্রথম বাক্য যেটা বলেছিলেন— আমি কিশোর মজুমদার। এই সংস্থার পক্ষ থেকে বলছি..., না?"
কিশোর আবার একটা বোকা হাসি দিল। মনে-মনে বলল, 'আমার বলা প্রথম বাক্যটি তোমার মনে ধরা থাকবে, সে আর আমি কী করে বুঝব বলো?'
মধুরিমা বলল, "আপনাকে ধন্যবাদ। শুধু কনভিন্সড করার জন্যই সেদিন আমাকে আপনি কথাগুলো বলেননি। এখানকার ক্লাসগুলো আমার সত্যিই ভাল লাগছে। অন্য সংস্থাগুলোর থেকে আলাদা, সামথিং ডিফারেন্ট আর...।"
"আর?"
"ইউ আর একস্ট্রা অর্ডিনারি টু।"
মধুরিমা হাসি বিলিয়ে চলে গেল। কিশোর মনে মনে চিৎকার করে উঠল— 'হোয়ে-হোয়ে-ক্রেজি কিয়া রে।'

সুহাসিনী মাঝে-মাঝে ভাবেন, কী করে যে ওই দু'টো মেয়ের সঙ্গে পার্কে আলাপ হল! সেই থেকে সংসারটা পালটে গেল আমার। কী জানি, আগের জন্মের ভাইঝি-বোনঝি কি না? মুকুলিকাকে পালটে দেওয়া সোজা ব্যাপার নয়! একটু-আধটু দুষ্টু বুদ্ধি যে মুকুলিকার এখনও নেই একেবারে তা নয়। পুরোপুরি সংশোধন তো কারও হয় না। কিন্তু একেটাই শান্তি বজায় রয়েছে এই পরিবারে।
কাজকর্ম করা নিয়ে অসুবিধে হচ্ছিল। ঠিকে লোকদের নিয়ে তো সব সময়ের খুচ-খাচ কাজগুলো হয় না। ওরা পটকাকে দিয়ে গিয়ে সেই সমস্যাটাও মিটিয়ে দিয়ে গেল। ছেলেটার এত বুদ্ধি, সব কিছু সামলে নেয়। দু-চারদিনেই এ বাড়ির প্রত্যেকের ধাত বুঝে গেছে।
ছেলেটার মাইনে দিতে হয় না বলে মুকুল খুব খুশি। কিন্তু ওর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে আর একটু যত্ন নিতে পারে, সেটা নেবে না। কী আর করবে সুহাসিনী? স্কুল থেকে নিয়ে আসার সময় এক একদিন এটা-সেটা খাওয়ান ওকে নিজের পয়সা দিয়ে।
পটকাকে সেদিন তিনি বললেন, "তোর স্কুলে তো মাইনে লাগে না। সামান্য যা খরচ লাগে, সে একশো টাকাও নয়। বইখাতা তো তোর দিদিমণিরাই দিয়ে গেল এসে। আমি তোকে কী দিই বল তো?"
"যখন আমার লাগবে চাইব।" পটকার নির্ভেজাল উত্তর।
একদিন বিকেলে পার্কের ধারে দাঁড়িয়ে সুহাসিনী বললেন, "পটকা, ফুচকা খাবি?"
"খাব।" ওর চোখ দু'টো নেচে উঠল, "চলো-চলো।"
ফুচকাওয়ালার কাছে শালপাতা নেওয়ার সময় পটকা বলল, "এ কী! আমি একা খাব নাকি? তুমিও পাতা নাও।
ফুচকাওয়ালা, ঠাকুমাকে পাতা দাও।"
"না-না, কী যে বলিস তুই। আমি বুড়োমানুষ, ফুচকা খাব? লোকে দেখলে শুনলে বলবে কী?"
"কেউ দেখবে—শুনবে না। খাও তো আমার সঙ্গে। তুমি না খেলে আমিও খাব না।"
ফুচকাওয়ালা পাতা এগিয়ে বলল, "খান-খান মাইজি, কুছু হোবে না। ফুচকা খানেকি কোই উমর নেহি হোতা।"
সুহাসিনী লজ্জা-লজ্জা মুখে শালপাতা নিলেন। তারপর দু'জনেই হেসে-হেসে ফুচকা খেতে লাগল। যেন বিরাট একটা কাণ্ড ঘটাচ্ছে তারা। টুপটাপ করে অনেকগুলো ফুচকা খেয়ে ফেলল ওরা।
তারপর বাড়ি ঢোকার সময় দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে একটা মোক্ষম হাসি হাসল। যার মানে বলে দেওয়ার দরকার নেই। ফুচকা কাণ্ডটা গোপন থাকবে।
মানুষের বয়স হয়ে যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে বুড়ো হয়ে যায়। কিন্তু প্রত্যেকের মনের মধ্যে কৈশোর, তারুণ্য-যৌবনটা লুকিয়ে বসে থাকে। তাকে কারও সামনে বের করা যায় না। পাছে লোকে কিছু বলে।
সুহাসিনী ভাবছিলেন, ফুচকার স্বাদ একরকম আছে। অবিকল সুস্বাদু। না বুঝেই ফুচকাওয়ালা একটা অসাধারণ দার্শনিক কথা বলেছে— ফুচকা খানেকি কোই উমর নেহি হোতা।
সুহাসিনী মনে-মনে ঠিক করে ফেললেন, রাগিণী আর শর্বরীর জন্য তিনি কিছু কাজ করবেন, করবেনই। শুধু ওদের ডাকের অপেক্ষা।

৯

শর্বরীর স্কুলে পরীক্ষা চলছিল। সেই কারণে একটু ব্যস্ত ছিল। ছুটির পরও বাড়ি ফিরতে-ফিরতে দেরি হয়ে যাচ্ছে। পরীক্ষার পর খাতার বাণ্ডিল নিয়ে বাড়ি ফিরল একদিন। এবার শুরু হবে বাড়ি বসে খাতা দেখার পালা।

শর্বরী ভাবল, 'আমার আর ফুরসত কোথায়, তবু এর মধ্যেই একদিন পটকার জন্য সময় বের করতে হবে।'

রাগিণী এখন অফিসের অন্য সেকশনে কাজ করে। একেডি সুস্থ হয়ে জয়েন করেছে কিন্তু রাগিণীকে পার্সোনাল অ্যাসিসটেন্টের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। অন্য আর একটি মেয়ে সেই জায়গায় বহাল হয়েছে। তবে তার ওপর একেডি কোনও জুলুম করে না বলেই ধারণা রাগিণীর। সে নিয়মে আসে নিয়মে যায়। ওভার-টাইমের কথা কখনও একেডি তাকে বলে না। আর নিজের ঘরে বেলা শেষে ডিকটেশন দিতে ডেকে নিয়ে বসায়ও না। শর্বরী একদিন রাগিণীর অফিসে এসেছিল, সকলের সঙ্গে 'হ্যালো'-'হাই' করে গেল। একেডি'র চেম্বারে ঢুকল না। রাগিণীকে পরে একদিন অসিত জিজ্ঞাসা করেছিল, ''শর্বরী কি আপনার চেনা?''

''হুঁ।'' এর বেশি জবাব দেয়নি রাগিণী। অবশ্য রাগিণী অসিতকে পাত্তাও দেয় না। সে তো কোনও দোষ করেনি। কথায় বলে, ক্লিন হ্যান্ডস অ্যান্ড পিওর হার্ট উইল মেক ইউ স্ট্রং। রাগিণী নিজের মেজাজে থাকে।

ওর অফিসে সেরকম একটা চাপ নেই। সেই জন্যই শর্বরীকে বলল, ''দ্যাখ, আমার অফিসে তোর থেকে চাপ কম। স্কুলের হ্যাপা বেশি। বাড়ি অবধি তার দৌড় চলে। তুই খাতা-টাতা দেখ। আমি একদিন সন্ধেবেলা পটকাকে ওর পিসির বাড়ি ঘুরিয়ে আনি।''

''যাবি? তাহলে তো ভালই হয়। দরকার হলে কিশোরকে ডেকে নে।''

''কোনও দরকার নেই। ছুটির পর আমি অফিসে আর থাকি না। ওখান থেকেই সোজা চলে যাব মাসিমার বাড়ি।''

''বেশ তাহলে তাই কর। পটকাকে বলিস অন্য একদিন আমি যাব। আর তুই ওই পিসির বাড়িটা ভাল করে চিনে আসিস। শত হলেও পটকার একজন আত্মীয়র সন্ধান পেয়ে ভালই লাগছে। আমাদের উপর চাপটা কমে গেল।''

''কিছুই কমে গেল না। দরকারের সময় সেই আমাদেরই যেতে হবে। পিসের ভয়ে পিসি মুখ লুকিয়েই থাকবে। এই সব আত্মীয়দের আমার চেনা আছে।'' শর্বরী হাসল। রাগিণীর কথাটা একটু কাটা-কাটা শোনায় বটে কিন্তু সত্যি কথাই বলে।

সুহাসিনীর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে পটকা চলল পিসির বাড়ি। রাগিণী শিয়ালদহ পর্যন্ত অটোতে এসে একটা ট্যাক্সি নিল। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে পটকাকে বলল, ''পিসির জন্য কিছু কিনব নাকি পটকা?''

''হ্যাঁ। রাগিণীদি, আমার কাছে জমানো দু'শো পঁয়ত্রিশ টাকা আছে। এতে কি পিসির জন্য একটা শাড়ি কেনা যায়?''

''হ্যাঁ যায়, একটা ছাপা শাড়ি দু'শো টাকাতেই হয়ে যায় কিন্তু তিনশো হলে একটু ভাল হয়। চল, আমি কিছু দিই। দুইয়ে মিলে একটা ভাল শাড়ি কিনে নিই।''

''না রাগিণীদি, তুমি দু'শো টাকা দিয়েই একটা ছাপা শাড়ি কিনে দাও। আমার নিজের টাকাতেই দিতে চাই।''

রাগিণী মনে-মনে অবাক হল, ওইটুকু ছেলের আত্মবোধ দেখে খুশি হল। দু'জনে মিলে একটা দোকানে গিয়ে একটা শাড়ি কিনল। পটকাই পছন্দ করল, আকাশি রঙের একটা শাড়ি। রাগিণী কমলা রঙের একটা শাড়ি পছন্দ করেছিল, পটকা বলল, ''না, পিসির এই রঙটাই পছন্দ।'' শাড়িটার দাম নিল দু'শো পঁচিশ টাকা। আহ্লাদে পটকার চোখ হেসে উঠল। দশটা টাকা পকেটে রেখে দিল।

পিসি সত্যিই পটকাকে ভালবাসে। খুব খুশি হল তাকে দেখে। পিসির নাম সন্ধ্যামণি। বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে। সে একটা বাড়িতে আয়ার কাজ করে। তার শাশুড়ি গত হয়েছে। সময়ও আছে এখন। আর দু'টো পয়সা রোজগার করতে কে না চায়?

সন্ধ্যামণি পটকার সব কথা শুনল। রাগিণী-শর্বরীর কথাও জানল। সন্ধ্যামণি কৃতজ্ঞতায় রাগিণীর হাত জড়িয়ে ধরল, ''সম্পূর্ণ একটা অচেনা ছেলের জন্য আপনারা এত করলেন? আপনারা না থাকলে পটকা আজ এই জায়গায় পৌঁছত কেমনে?''

সন্ধ্যামণির কথায় ঈষৎ বাঙাল টান আছে। স্বভাবটা ভারি আন্তরিক। পটকার দেওয়া শাড়ি পেয়ে সে যে কী খুশি, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ''আমি ভাবতি পারছি না, তোর ওই পিসে তোকে একদিন খাওয়ার খোঁটা দিয়ে এই বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। মেরেও ছিল। সেই তুই আজ চাকরি করে আমার জন্য শাড়ি কিনে এনেছিস?''

''কাঁদছ কেন পিসি? পরে আরও ভাল কিছু দেব। দূরে থাকলেও তোমাকে ভালবাসি। আমি লেখাপড়া শিখছি। সবই এই দিদিদের জন্য। এরা খুব ভাল। যেখানে থাকি সেখানকার মা-ও খুব ভাল।''

''লেখাপড়া শিখছিস? ভাল-ভাল, খুব ভাল।''

''পিসে কি এখনও মদ খায়? খারাপ ব্যবহার করে তোমার সঙ্গে?''

''ও কি পালটানোর জিনিস? একই রকম আছে। খুব খারাপ লোক। স্বামী তো তাই মরণ কামনা করতে পারি না। থাক আমার দুঃখের কথা। তবু তো বাইরে বেরিয়ে একটু বেঁচেছি।''

রাগিণী এই সব লোককে চেনে। এরা নিজের বউয়ের ওপর অত্যাচার করে এক

ধরনের সুখ পায়। শুধু নিজের বউ কেন, নিজের থেকে দুর্বল, যারা প্রতিবাদ করতে পারবে না, তাদের উপর ক্ষমতা ফলায়। সন্ধ্যামণির স্বামীর নাম মন্মথ। বোঝাই যাচ্ছে মন্মথ একটা হাড়-বজ্জাত লোক। পটকা এদের কথা কিছুই বলেনি এত দিন। কী বলবে? খারাপ আত্মীয় হল পায়ের পাতার চুলকানির মতো। না সারানো যায়, না সরানো যায়। দেখানোও যায় না।

ফেরার সময় রাগিণী সন্ধ্যামণিকে বলল, ''যদি কখনও খুব দরকার পড়ে আমাদের কাছে এসো। তুমি তো ভাল লোক। কিছুতেই ভয় পেও না।''

''আচ্ছা দিদি, তোমরা লোকের ভাল কর। আমারও ইচ্ছে হয় করতে। পটকার ভাগ্য ফিরিয়ে দিয়েছ। একটা প্রণাম করব?''

রাগিণী ধরে ফেলল সন্ধ্যামণির হাত, ''না, তুমি বয়সে আমার থেকে বড়, কক্ষনও পায়ে হাত দেবে না। তোমাকে আমার খুব ভাল লেগেছে সন্ধ্যামণি। আমার ফোন নম্বরটা রাখো।''

খারাপ আত্মীয় হল পায়ের পাতার চুলকানির মতো। না সারানো যায়, না সরানো যায়।

১০

কালও মদ খেয়ে এসে বউকে মেরেছে মন্মথ। আগে পড়ে-পড়ে মার খেত সন্ধ্যা, এখন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। গালাগালিও দেয় নিচু গলায়। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর থেকে এইটুকু করার সাহস হয়েছে তার। ক্ষমতাও। ভালবাসা-টাসা নেই কিন্তু বন্ধনটাও অস্বীকার করতে পারে না।

সকালে স্টোভে ভাত বসিয়ে মনে-মনে ভাবছিল, যে লোকটা রাতে ওকে ওভাবে আঘাত করে, নির্মম আচরণ করে, সেই লোকটার জন্যই ও সকালে রান্না করে, কী আশ্চর্য!

সন্ধ্যামণি সকালে রান্না করে রেখে চলে যায়। মন্মথ বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে। বউয়ের সঙ্গে আর দেখা হয় না। ভাত খেয়ে কারখানায় যায়। সন্ধ্যা নিজের দুপুরের খাবার কৌটো করে নিয়ে যায় সঙ্গে। চাকরির শর্তে খাবার পাওয়ারই কথা, তবে না খেলে পুরো পারিশ্রমিকটা পাওয়া যায়। খেলে একটা ছোট অংশ কাটা যাবে। সন্ধ্যা ভেবে দেখেছে, মন্মথর জন্য তার সকালে রাঁধতেই হবে। একজনের জন্য রান্না করতে যে খাটনি, দু'জনের জন্য রান্না করতেও তাই। তাহলে আর ওই বাড়িতে না খেয়ে কী হবে?বরং খাবার বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়াই ভাল। তবে সন্ধ্যা ভেবে রেখেছে, মন্মথ যদি না থাকে তাহলে সকালের রান্নার পাট সে চুকিয়ে দেবে। কাজের বাড়িতেই খেয়ে নেবে। টাকা একটু কম দিলে দেবে। কিছু এসে যাবে না। এই 'মন্মথ যদি না থাকে' কথাটা ভাবতে সন্ধ্যার কোনও দুঃখ হয় না। ওদের দাম্পত্যে ওই সব আবেগ-টাবেগ কবেই বাড়তি জঞ্জাল হয়ে গিয়েছে। হবে নাই বা কেন? কী সুখ দিয়েছে মন্মথ সন্ধ্যাকে? যখন-তখন মুখ খারাপ করে গালাগালি দেওয়া। ছুতোয়-নাতায় চড়-চাপড়। অথচ রাতে ঘাড় ধরে জোর করে বিছানায় বউকে টেনে নিয়ে এসে জবরদস্তি স্বামীত্বের ট্যাক্স আদায় করা। সন্ধ্যার ইচ্ছে অনিচ্ছে বা ভাল লাগা-মন্দ লাগার কোনও ধারই ধারে না সেই বদমাশটা। সুতরাং দু'জনের মধ্যে যৌনতা কিছু নেই। যা আছে তা শুধু একপেশে যৌন উৎপীড়ন। প্রথমে সন্ধ্যা রাগ করে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করত কিন্তু পারেনি। বোধহয় গায়ের জোরে পেরে ওঠেনি বলেই। বরং মেনে নিয়েছে। দেখেছে 'মেনে নিলে' সময় বাঁচে। ঘুমোতে পারে তাড়াতাড়ি। মোদোটা কাজ সেরেই ঘুমিয়ে পড়ে। আর কোনও দিকে তাকায় না।

আজ তাড়াতাড়ি হাঁটছিল সন্ধ্যা। আট'টার মধ্যে পৌঁছতে হয়। যে বৃদ্ধাটিকে সে দেখাশোনা করে তাকে বিছানা থেকে তুলে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারাতে হয়। খুব কম কথা বলে বৃদ্ধাটি। তবে সন্ধ্যাকে বোধহয় ভালবাসে। ওর দিকে তাকিয়ে মাঝে-মাঝে হাসে। বেশ একটা ইতিবাচক হাসি। বোঝা যায় সন্ধ্যার উপর সে খুশি। বেশির ভাগ সময়ই চোখ বুজে থাকে। পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার পরে সে আর কোনও অভিব্যক্তি প্রকাশ করে না। সন্ধ্যা তাকে 'মাসিমা' বলে। মাসিমা না বলে কাকিমা, জেঠিমা, পিসিমা, যাই বলত তাতে তাঁর কিছু এসে যেত বলে মনে হয় না।

প্রত্যেকদিন মাসিমার ছেলে অফিসে যাওয়ার সময় এ ঘরে এসে ডাকে একবার, ''মা।'' মাসিমা চোখ খুলে তাকায়। ''কেমন আছ মা?'' মাসিমা একটু মৃদু হাসে তারপর আবার চোখ বুজে ফেলে। রোজ একই দৃশ্যের অভিনয়। দৈবাৎ একটা দু'টো হুঁ-হাঁ-না জাতীয় কথা শোনা যায় মাসিমার মুখ থেকে।

মাসিমার ছেলেকে সন্ধ্যা দাদাবাবু বলে। মাসিমার কিছু দরকার হলে দাদাবাবুকে বলে দেয় সন্ধ্যা। দাদাবাবুর নামটা জানে সন্ধ্যামণি— দাদার নাম বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্রর বউ নেই। মারা গিয়েছে। যত দিন সে বেঁচে ছিল মাসিমার জন্য আয়া রাখা হয়নি। বউমা আর শাশুড়ির মধ্যে দারুণ সমঝোতা ছিল। বউমার নাম ছিল নলিনী। ক্বচিৎ মাসিমা বিড়বিড় করে 'নলিনী' নামটা উচ্চারণ করে। এমনিই। যেন তার ভাল লাগে উচ্চারণ করতে। এত দিন আছে এখানে সন্ধ্যা, কোনও দিন মাসিমা ছেলের নাম মুখে আনে না। বীরেন্দ্র-বীরেন-বীরু, কিচ্ছু না। কিন্তু ছেলে মা'কে সত্যিই ভালবাসে।

বীরেন্দ্র বড়লোক নয়, তবু মায়ের জন্য আয়া রেখে দিয়েছে। মায়ের যেন কষ্ট না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখে। সত্যিই তো, টাকা থাকলেই ভালবাসা থাকবে এর কোনও মানে নেই। অনেক ধনী ছেলেই মা'কে বৃদ্ধাবাসে রেখে হাত ধুয়ে ফেলে। বীরেন্দ্র সেরকম নয়। সে উচ্চবিত্ত নয়, তবে উচ্চচিত্ত। বাবার গল্প করে তাঁর মেয়ে পদ্মিনী।

পদ্মিনী, ডাক নাম পান্না। এ বাড়ির অক্সিজেন। পান্নার মনটা ফুলের চেয়েও সুন্দর। সে ভারি নম্র। সবাইকে ভালবাসে। মানুষকে তো বটেই, কাক, শালিক, চড়াই, কিংবা বেড়ালকেও। পান্না সন্ধ্যাকে পিসি বলে। কত দিন এমন হয়েছে, সন্ধ্যা রান্নাঘরের কোনায় বসে বাড়ি থেকে আনা টিফিন কৌটো খুলে ভাত-ডাল-তরকারি খাচ্ছে, পান্না উড়ে এসে নিজের মাছটা সন্ধ্যার পাতে ফেলে দিয়ে গেল।

সন্ধ্যা হাঁ-হাঁ করে উঠেছে— ''এটা কি হল? কেন দিলে মাছটা?''

''তুমি খাবে বলে।''

''না-না, এরকম কোরো না পান্নামণি।''

পান্না শুধু মিষ্টি-মিষ্টি হাসে। 'পান্নামণি' নামটা সন্ধ্যার দেওয়া। লজ্জায় মিশে যায় সন্ধ্যা, "তোমার বাবা জানতে পারলে কি হবে? ছিঃছিঃ।"
পান্না একপাক ঘুরে আঙুলের কর গোনে, "এক নম্বর, বাবা জানবেই না। দু'নম্বর, বাবা জানলেও কিছু হবে না। তিন নম্বর, বাবা তার মেয়েকে ভাল করেই চেনে। পিসি, খাবার ভাগ করে খেলে পুষ্টি বাড়ে, জান না?"
সন্ধ্যা পান্নাকে খু-ব ভালবাসে। পান্নার পিসি ডাক একসময় সন্ধ্যার মনে পটকার জন্য দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল।
এই সারা বাড়িটায় 'কথা' নামক জিনিসটা বেঁচে আছে শুধু পান্নার কাছে সন্ধ্যার জন্য আর সন্ধ্যার কাছে পান্নার জন্য।
বাড়ির সব গল্প পান্না পিসির কাছে করে। মা কেমন ছিল, ঠাকুমা কেমন ছিল। বাবার গল্পও করে। আর সন্ধ্যা পান্নাকে অনেক যত্ন করে। জলখাবার বানিয়ে দেয়। চুল আঁচড়ে দেয়। জামা ইস্ত্রি করে দেয়। বীরেন্দ্র একদিন বলেছিলেন, "মা'কে দেখাশোনার জন্য তোমাকে টাকা দেওয়া হয়। তুমি পান্নার জন্য এতটা করলে আলাদা টাকা দেব আমি।" সন্ধ্যা মাথা নিচু করে 'না' বলেছে। সব জায়গায় কি ভালবাসার মূল্য ধরতে হয়?

একদিন বাড়ির চাবি ভুল করে নিয়ে চলে এসেছিল সন্ধ্যামণি। মন্মথ বাড়ি খুঁজে খুঁজে এসে এখানে হাজির। কড়া নাড়তেই পান্না গিয়ে দরজা খুলল, "কে? কাকে চাই?"
মন্মথ পান্নার দিকে তাকিয়ে আছে, "সন্ধ্যা আছে? এ বাড়িতে সে আয়ার কাজ করে।"
"হ্যাঁ। আছে। দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি।" পান্না ভিতরে ঠাকুমার ঘরে যাচ্ছিল, মন্মথ তাকে ডাকল, "শোনো, এক গ্লাস জল দেবে?"
"হ্যাঁ দিচ্ছি। আপনি ভিতরে এসে দাঁড়ান।"
পান্না সোজা গিয়ে সন্ধ্যাকে বলল, "পিসি, একটা লোক তোমাকে ডাকছে।"
"আমাকে? এখানে?"
সন্ধ্যামণি তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখল মন্মথ। সে বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি এখানে কেন এসেছ?"
"ঘরের চাবি নিতে এসেছি। কাঠের গাদায় আজ রেখে আসোনি।"
"হ্যাঁ। ভুল করে নিয়ে এসেছি।" আঁচলের কোণ থেকে গিঁট খুলে সন্ধ্যা চাবি দিচ্ছিল, এমন সময় জল হাতে পান্না ঢুকল। মন্মথ গ্লাস নিয়ে জল খেল। সন্ধ্যা ভুরু কুঁচকে বলল, "জল কেন পান্না?"
"আমি চেয়েছিলাম। বড্ড পিপাসা পেয়েছিল।"
"ঠিক আছে, যাও। বাড়িতে জলের অভাব নেই।"

সন্ধ্যা বাড়ির চাবিটা ওদের কাঠের বস্তার মধ্যে রেখে আসে, যেদিন ও পরে আসে। কারখানায় মর্নিং শিফট থাকলে মন্মথ সকালে বেরিয়ে যায় আগে। তাই এইরকম ব্যবস্থা। সে ঠিক আছে, কিন্তু মন্মথর এইরকম হুট করে ওর কাজের বাড়ি চলে আসাটা পছন্দ হল না সন্ধ্যামণির।
বাড়ি গিয়ে সে কথা বলেও দিল ও সোজা। কিন্তু কী আশ্চর্য, আবার কয়েক দিন পর মন্মথ পান্নাদের বাড়ি হাজির। সন্ধ্যামণি জিজ্ঞাসা করল, "আজ তো চাবি আনিনি আমি!"
"না, এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম তুমি যদি এখন যাও, সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি।"
"আমি? এখন যাব না, তুমি যাও।"
পান্না গ্লাসে জল এনে দিল, "আপনার জল।"
"এখানে এলেই কি তোমার তেষ্টা পায়? আশ্চর্য!"
মন্মথ সে কথার উত্তর দিল না। চলে গেল। সন্ধ্যার কিন্তু এভাবে মন্মথর এখানে আসা ভাল লাগল না।
লোকটাকে সে হাড়ে-হাড়ে চেনে। কী জানি, চুরি-সাফাইয়ের মতলব করেছে কি না মন্মথ। বাইরের ঘরে দামি কিছু আছে কি না দেখল সন্ধ্যা। দেওয়াল ঘড়ি আছে, টেবিলে বোন-চায়নার দু'টো দামি পুতুল আছে। পিতলের ফুলদানি-অ্যাশট্রে। যাক, এসবে নজর রাখতে হবে। দাদাবাবু আবার যেখানে-সেখানে মানিব্যাগ-ঘড়ি ফেলে রাখে।
বাড়িতে একদিন রাতে সন্ধ্যামণি জোরগলায় বলে দিল, "তুমি ওই বাড়ি একেবারে যাবে না। আমার অসুবিধে হয়।"
উদাসীন গলায় বলল মন্মথ, "বেশ তো যাব না।"
এর পরেও একদিন আবার সেই বাড়ি গিয়ে হাজির মন্মথ। গিয়ে পান্নাকে বলেছে, "তোমার পিসিকে ডাকতে হবে না। আমার তেষ্টা পেয়েছে তাই এলাম, এক গ্লাস জল দাও। খেয়ে চলে যাই।"
পান্না জল আনতে ভিতরে যাচ্ছিল, মন্মথ বলে উঠল, "তোমরা বুঝি কেউ জল চাইলে তাকে শুধু জলই দাও? সঙ্গে কিছু দাও না?"
"সঙ্গে? কী দেব? ও সব আমি কিছু জানি না। সবই পিসির দায়িত্বে। কিছু দেবে কি না জিজ্ঞাসা করব?"
"না-না, ঠিক আছে। শুধু জলই দাও।"
জল খেয়ে চলে গেল মন্মথ। পান্না ভিতরে গিয়ে হাসতে লাগল। সন্ধ্যা মাসিমার চুল বেঁধে দিচ্ছিল, "বলল, কী হয়েছে গো পান্নামণি?"
"তোমার বর এসেছিল গো পিসি। জল খেয়ে চলে গেল।"
"আমাকে ডাকলে না কেন? আশ্চর্য!"
"তোমাকে ডাকতে বারণ করল যে। ভয় পায় নাকি তোমাকে?"
"আমাকে ডাকতে বারণ করল?"
মাসিমার চুল বাঁধা হয়ে গিয়েছিল, সে দৌড়ে গেল বাইরের ঘরে। না-না, জিনিসপত্র সব ঠিক জায়গাতেই আছে। মন্মথর হাব-ভাব সন্ধ্যা কিছুই বুঝতে পারছে না। পান্নাকে সে শুধু বলল,

''আমার বর এর পরে এলে আর জল দেবে না। আমাকে ডাকবে। ও মানুষটা ভাল নয়। এখানে একটা কিছু ঝামেলা পাকানোর তাল করছে বোধহয়।''
সেই দিন রাতে সন্ধ্যা মটকা মেরে শুয়ে রইল। আজ ও যাবে না স্বামীর বিছানায়। একটুও ইচ্ছে করছে না আজ। সন্ধ্যাকে শুধু ভোগের সামগ্রী বানিয়ে রেখেছে লোকটা। এত দিনে সন্ধ্যা মা-ও হয়নি। অথচ বলতে গেলে লোকটা তাকে একটা রাতের জন্যও ছাড়েনি। মনের ভিতর থেকে সন্ধ্যার অনিচ্ছে আর বিদ্রোহ কবে থেকেই তো শুরু হয়েছে কিন্তু কিছু করে উঠতে পারে না। ক'টা মেয়েই বা পারে? একটা কাজ করতে পেরেছে শুধু সন্ধ্যা। খাটের উপর মন্মথকে একা ছেড়ে দিয়ে নীচে বিছানা করে ঘুমোয় ও। জোর করে শরীরের খাজনা আদায় করতে পারে স্বামী কিন্তু প্রেম নেই যখন, তখন এক বিছানায় ঘুমোনোর কী স্বাদ আছে বুঝতে পারে না সন্ধ্যা। বরং সে মেঝেতে দিব্যি ঘুমোয়।

আজ সন্ধ্যা কাজে যায়নি। জ্বর হয়েছে ওর। দুপুরবেলায় নিজের ঘরে শুয়ে সন্ধ্যা ভাবছিল, এমন হঠাৎ করে কামাই করল ও, ওখানে সকলের খুব অসুবিধে হবে। মাসিমা'কে নিশ্চয়ই দাদাবাবু আজকের মতো সামলে নেবে। কাল ও পান্নাকে বলে এসেছে, ''শরীরটা ভাল লাগছে না পান্নামণি, যদি জ্বর আসে কাল বোধহয় আসতেই পারব না।'' পান্না অবশ্য সঙ্গে-সঙ্গে বলেছে, ''না-না, জ্বর এলেও তুমি আসবে পিসি। স্কুল থেকে ফিরে না হলে আমি কার সঙ্গে কথা বলব? ঠাকুমা তো থেকেও না থাকার মতো, আর বাবা আসবে রাত করে। আমার বড্ড একা লাগবে। তুমি ওষুধ খেয়ে এখানেই শুয়ে থেকো।''
''কাজ করতে এসে শুয়ে থাকা যায়? দেখি, গায়ে বড্ড ব্যথা হয়েছে। পারলে আসব। দাদাবাবুকে একটু বলো, তিনি জানেন সন্ধ্যামণি কখনও শুধু-শুধু কামাই করে না।''
সন্ধ্যারও কাজে যেতে না পেরে ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। খুব মায়া পড়ে গিয়েছে ওই বাড়ির উপর। পান্নাকে সে সত্যিই ভালবাসে। পান্নাও। দেখা যাক, ওষুধ তো খেয়েছে, একটু ভাল থাকলে কাল যাবে ও।
সন্ধের দিকে মন্মথ ফিরল একবার। ভুরু কুঁচকে সন্ধ্যাকে বলল, ''তুমি বাড়িতে?''
''আমার জ্বর হয়েছে।''
''ও।'' বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল মন্মথ। একবার ছুঁয়েও দেখল না জ্বরো বউটাকে। তবু সন্ধ্যা বলল, ''চা করে দেব? কিছু খাবে এখন?''
''না-না, কিচ্ছু লাগবে না।''
একটু পরে মন্মথ বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যা ভাবল, চা খাবে কেন বাবু? ভরপেট মদ খেয়ে রাতে ফিরে অসুস্থ বউয়ের ওপর স্বামীত্ব ফলাবে।
নিজেই চা করে মুড়ি দিয়ে খেল সন্ধ্যা। কী জানি, পান্না স্কুল থেকে ফিরে কী খাচ্ছে? ম্যাগি করতে শিখেছে। টোস্টারে টোস্টও করে নিতে পারে। স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়ছে তবুও ছোটই। গরিবের ঘরে মেয়েরা তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যায়। আদরের ঘরে বয়স বাড়ে না।
রাতের রান্না হয়ে গেছে সন্ধ্যার। মন্মথ এখনও ফেরেনি। কোথায় রয়েছে কে জানে? ঘরে বউ অসুস্থ তো তার কী? নিজের খাবার খেয়ে নিল সন্ধ্যা। মন্মথর খাবার চাপা দিয়ে রাখল। যখন আসে খাবে।
নীচে নিজের বিছানা করে শুয়ে পড়ল ও। মন্মথ এল আর একটু রাত করে। এসে একটা কথাও বলল না। খেতেও বসল না। নিজের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। সন্ধ্যা মনে-মনে ঠিক করে রেখেছে। আজ হাজার টানলেও ও মন্মথর বিছানায় যাবে না। মানুষের শরীর তো, একদিন বিশ্রাম সে পেতেই পারে। শরীরটা আজ তার সত্যিই ভাল নেই।
সন্ধ্যা অবশ্য অবাক হয়ে দেখল মন্মথ ওকে জোর করল না আজ। ছেড়েই দিল বুঝি! তাও ভাল, অসুস্থ বউকে আজ দয়া করল।

আজ সন্ধ্যা তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেল। মাসিমা ক্ষীণ স্বরে কেবল বলল, ''কাল?''
''কাল জ্বর হয়েছিল মাসিমা।''
বীরেন্দ্র আজ সন্ধ্যাকে দেখতে পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তবু ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা করল, ''আজ ভাল আছ তো? পারবে কাজ করতে?''
''হ্যাঁ-হ্যাঁ পারব। আমি এসে গিয়েছি, আপনি আর কিছু ভাববেন না। পান্না কোথায়? তাকে তো দেখছি না।'' আমার উপর রাগ করেছে বুঝি, মনে-মনে ভাবল সন্ধ্যা। বীরেন্দ্র বলল, ''ওঠেনি এখনও। কাল রাতেও কিছু খায়নি। আমাকে দরজা খুলে দিয়ে সেই যে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়েছে, আর উঠলই না। আমি ডেকেছি কত বার, সাড়াই দিল না।''
মাসিমাকে পরিচ্ছন্ন করে, প্রাথমিক কাজগুলো সেরে, সন্ধ্যা পান্নার ঘরের দরজায় ঘা দিল, ''ওঠো-ওঠো, পান্নামণি। দেখো আমি এসে গিয়েছি। কী খাবে বলো। রান্নার মাসিকে বলে দিই।''
পান্না দরজা খুলল না। আবার এসে সন্ধ্যা দরজা ঠকঠক করল, ''এত রাগ কোরো না গো আমার উপরে। ওঠো, তোমার স্কুলেরই দেরি হয়ে যাবে।''
আরও কয়েকবার কড়া নাড়ার পর পান্না দরজা খুলে ভেতরে টেনে নিল সন্ধ্যাকে। তারপর ''পি-সি-ই।'' বলে সন্ধ্যার বুকের ওপর আছড়ে পড়ে হাউহাউ করে কাঁদতে লাগল।
''কী হয়েছে গো পান্নামণি? কী হয়েছে তোমার?''
পান্না উত্তর দিল না। কান্না তার বেড়েই চলল। এবার বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদতে থাকল।
সন্ধ্যা তো অবাক। এত দিন ধরে আসছে এখানে, পান্নাকে কখনও কাঁদতে দেখেনি, কী হয়েছে মেয়েটার? বিছানার কাছে এসে কোলে তুলে নিল পান্নাকে সন্ধ্যা। তারপর ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ''কী হয়েছে তোমার, আমাকে বলো।''
কাঁদতে-কাঁদতে পান্না বলল, ''কাল তোমার বর এসেছিল পিসি।''
''এইখানে, কেন? ও তো জানত আমি কাজে আসিনি। কী বলেছে এসে?''
''আমি তো ও সব জানি না। এসে তোমার খোঁজ করল, আমি বললাম, পিসি আজ আসেনি। রোজের মতো জল চাইল। আমি জল নিতে ভিতরে এলাম। পিছন থেকে এসে আমাকে...।''
''কী-ই...ই! তুমি চেঁচালে না কেন?''
সন্ধ্যার মাথার মধ্যে দোদোমা ফাটছে। 'আমার মুখ বেঁধে দিয়েছিল। লোকটার গায়ে কী জোর!'' হু-হু করে কাঁদতে লাগল পান্না।
''ওকে আমি পুলিশে দেব। এত সাহস! এখনই যাচ্ছি দাদাবাবুর কাছে।''
''না-না, বাবাকে কিছুতেই বোলো না তুমি।'' সন্ধ্যাকে জড়িয়ে ধরল পান্না।
''বলতে তো হবেই। তুমি ভেবো না। এই অন্যায়ের শাস্তি চাই।''
''না-না, পুলিশ এসে প্রথমেই আমাকে...। না-না, বাবার সামনে আমি দাঁড়াতে পারব না। আমি মরে যাব। এমনিতেই আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।''
''ও কী কথা! মন শক্ত করো। তোমার তো কোনও দোষ নেই। ওকে পার পেতে দেওয়া যাবে না। তুমি ভয় পেও না পান্নামণি, আমি তোমার সঙ্গে আছি।''
''না-না, আমি পারব না। এই নিয়ে হইচই হলে আমি গলায় দড়ি দেব, নয়তো বিষ খাব।'' ছটফটিয়ে উঠল পান্না।
''মা'গো, ও কী কথা!'' পান্নাকে জড়িয়ে ধরল সন্ধ্যা।

আজ স্কুলে গেল না পান্না। সন্ধ্যাকে দিয়ে বাবাকে বলাল, ওর অসুখ করেছে। এমন অসুখ তো জীবনে হয়নি তার। সন্ধ্যা অনেক বোঝাল। পান্না কিছুতেই রাজি হল না। সে সারাদিন ভাল করে খেল না, উঠল না, কথা বলল না। সেই হাসিখুশি মেয়েটা যেন মারা গেল সন্ধ্যার চোখের সামনে। আর সেই সর্বনাশ ঘটাল কি না সন্ধ্যারই স্বামী!

বাড়ি এসে সন্ধ্যা উনুন জ্বালল না, রান্না করল না। গুম হয়ে অপেক্ষা করতে লাগল মন্মথর জন্য। আসুক বাড়ি আজ। আগুন জ্বলছে তার শরীরে, মাথার মধ্যে বিছে কামড়াচ্ছে। মন্মথ খারাপ লোক সে কথা সন্ধ্যা জানে। তাই বলে, এই কাজ? তাও পান্নামণির সঙ্গে!

এর জন্যই বউকে টানেনি কাল? অসুস্থ বউকে দয়ামায়া করেছে না আরও কিছু। মিটমিটে শয়তান! আজ ওরই একদিন কী আমারই একদিন। সন্ধ্যা গজরাতে-গজরাতে মধ্যরাত পার করে দিল। মন্মথ বাড়িই ঢুকল না রাতে।

দেখা যাক ক'দিন বউকে এড়িয়ে থাকে ও। সকালেও রান্না করল না সন্ধ্যা। বাজার থেকে পঁউরুটি আর কলা কিনে নিয়ে গেল সঙ্গে করে। পান্না কাল ভাল করে খায়নি, সন্ধ্যাও। আজ যদি সে খায় তবে এই রুটি আর কলা খাবে সন্ধ্যা। না হলে সে-ও খাবে না।

বীরেন্দ্র একটু বেলায় বলল, ''তাহলে পান্নার জন্য ডাক্তার ডাকি! আজও যখন স্কুলে যাবে না বলছে, শরীর তাহলে বেশিই খারাপ হয়েছে।''

পান্না মাথা নাড়ল। ডাক্তারের দরকার নেই। আজ বিশ্রাম নিলে ঠিক হয়ে যাবে। কাল সে স্কুলে যাবে।

বীরেন্দ্র অফিস চলে গেল।

সন্ধ্যামণি সাধ্য-সাধনা করতে লাগল পান্নাকে। "ওঠো, চান করে ভাত খাও। একটু সুস্থ হও। এভাবে চললে বাঁচবে কী করে? মনে করো, বেড়াল-কুকুরে কামড়ে দিয়েছে তোমাকে।''

পান্না সারাক্ষণ কাঁদছে। তার এ কী হল! বেড়ালের দাঁতের দাগ মিলিয়ে যায় কিন্তু এ যা হল, সে তো আর ফেরানো যাবে না।

সন্ধ্যা বলল, ''তুমি শক্ত থাকলে দেখতে আমি ওর কী হাল করতাম। থানায় মার খেয়ে মরত। তারপর জেলে পচাতাম ওকে।''

''তাতে আমার যা গিয়েছে, সে কি আর ফিরবে পিসি? এই দেখ, দেখবে?'' পান্নার সারা গায়ে শয়তানের দাঁত আর নখের চিহ্ন! কেঁপে উঠল সন্ধ্যা। পান্না ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, ''বলো, এইগুলো ফেরাতে পারবে? আর... আর...।'' কথা শেষ করতে পারল না পান্না। বিছানায় লুটিয়ে কাঁদতে লাগল।

আজও ভাল করে খাওয়া হল না দু'জনের।

রাতে জেগে বসে আছে সন্ধ্যা। দেখবে ও কখন আসে। কাল আসেনি, আজ তো আসবেই।

সত্যি-সত্যি মন্মথ এল, বেশ রাত তখন। সন্ধ্যা উঠে দাঁড়াল, ''তুমি কেন করলে এটা? একটা ছোট মেয়ে! নির্লজ্জ।''

মন্মথ কোনও উত্তর দিল না। শোওয়ার উদ্যোগ করতে শুরু করল। ওর সামনে যেন কোনও জ্যান্ত মানুষ নেই।

''কথা কানে যাচ্ছে না? বদমাশ ইতর।'' সন্ধ্যা ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দাঁতে নখে। প্রথম আক্রমণে মন্মথ টলে গেল একটু। আঁচড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে দিল ওকে সন্ধ্যা। হিসহিস করে বলে উঠল ''কচি মেয়েটার সর্বনাশ করে ঘুমোতে এসেছ?''

মন্মথ হাতের উলটো পিঠ দিয়ে একটা জোড় থাপ্পড় লাগাল সন্ধ্যার গালে, ঘুরে পড়ে গেল সন্ধ্যা। আবার উঠে দাঁড়াল। সে খাটের তলা থেকে একটা বঁটি টেনে বের করেছে, ''শেষ করে ফেলব তোমাকে। পান্না আমার মেয়ের মতো। তার ক্ষতি করলে তুমি?''

মন্মথ সন্ধ্যার বঁটির কোপটা এড়িয়ে গেল এক লাফে, তারপর ধরে ফেলল ওকে। হাত মুচড়ে বঁটিটা ফেলে দিল মাটিতে, ''তোর এত সাহস? আমাকে মারবি? আমি কী করেছি? ওই মেয়েটাই খারাপ, আমার গায়ে পড়েছিল।''

''মিথ্যে কথা। তোমাকে ছাড়ব না আমি।'' বঁটিটা আবার মাটি থেকে তুলতে গেল সন্ধ্যা। মন্মথ ওর চুলের মুঠি ধরে বঁটিটা কেড়ে নিল। এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিয়ে চিড়চিড়ে গলায় বলে উঠল, ''বাঘের সামনে বিড়ালনির ফ্যাচ ফ্যাচানি? কেটে রেখে দেব।''

ঘরের কোণে বসে ফুঁসতে লাগল সন্ধ্যা, ''তোমাকে পুলিশে দেব, আমি নিজে গিয়ে পুলিশে সব বলে দেব। পুলিশের রুলের গুঁতো খেলে ঠ্যালা বুঝবে।''

''পুলিশে দেব তোমাকে'' সন্ধ্যার গলা নকল করে ভেংচে উঠল মন্মথ সন্ধ্যাকে। চোখ সরু করে বলল, ''সাক্ষী আছে কোনও? উলটে মেয়েটার বদনাম করে দেব।''

রাগে দুঃখে আক্রোশে দিশাহারা বোধ করল সন্ধ্যা। মারামারি করতে গিয়ে ওর কাপড় ছিঁড়ে গেছে। মোচড়ানো হাতে অসহ্য ব্যথা করছিল। গালটাও জ্বালা করছে। বুঝল, গায়ের জোরে সে পেরে উঠবে না পিশাচটার সঙ্গে। ভিতরে বাইরে জ্বলতে লাগল ও।

একটা কিছু করতেই হবে। শোধ নিতে হবে এই অপমানের। পান্নার হয়ে শাস্তি দিতে হবে। বাঘ? বাঘ সাংঘাতিক বটে কিন্তু তার দাঁত নখ কেটে নিলে তার আর জোর কোথায়? বাঘটাকে জ্যান্ত আগুনে পুড়িয়ে মারলে বোধহয় শাস্তি হয় সন্ধ্যার। এই বিড়ালনি যদি না ওকে শায়েস্তা করতে পারে তো কী বলেছি। ভিতরে-ভিতরে গর্জে উঠল

সন্ধ্যামণি।

রাগিণী প্রথমে ফোনের ওপ্রান্তে কে কথা বলছে বুঝতেই পারল না। গলাটাও কিছুটা অস্পষ্ট শোনাচ্ছে। রাগিণী আবার বলল, ''কে বলছেন? সন্ধ্যা? কে ভাই? আমি তো চিনতে পারছি না।''

''আমি নারকেলডাঙার সন্ধ্যা, সন্ধ্যামণি।'' রাগিণী যখন তাও চিনতে পারল না তখন ওপাশ থেকে মরিয়া গলা ভেসে উঠল, ''আমাকে চিনতে পারছেন না? আমাদের বাড়ি এসেছিলেন। আমি পটকার পিসি।''

''পটকার পিসি? এতক্ষণে এটা বলেননি কেন? হ্যাঁ চিনেছি। বলুন, কী ব্যাপার?''

''আপনার সঙ্গে আমার খুব দরকার। ভীষণ দরকার। একবার দেখা করতে পারি?'' সন্ধ্যার যে সত্যিই ভীষণ দরকার, সেটা তার কণ্ঠস্বরই প্রমাণ করছিল।

''পারেন।'' রাগিণী ঠান্ডা গলায় বলল।

পারবেও না। তাই আমাদের সাহায্য চেয়েছে।''

''ঠিক তাই।'' রাগিণী মাথা নাড়ল। ওরা দু'জনেই ভাবছিল ঝটিকাবাহিনী এখনও পর্যন্ত যে ক'টা সমস্যার সমাধান করেছে সেগুলি ডোমেস্টিক অফেন্স। কিন্তু মন্মথর অপরাধ অনেক বড়। শাস্তিও বড় মাপের হবে। সেখানে ওদের অবস্থানটা কী হতে পারে? তবে পিছিয়ে ওরা আসবে না। দুই বন্ধুতে ঠিক করল, একটা বড় মিটিং দরকার। শুধু দু'জনে নয়। কিশোরকে ডাকতে হবে, ডাকতে হবে সন্ধ্যামণিকেও।

কিন্তু মিটিংটা হবে কোথায়? রাগিণীর বাড়ি হতে পারে কিন্তু সেখানে হিমাদ্রিবাবু আছেন। কাউকে সাক্ষী রাখতে চায় না ওরা। রাগিণী শর্বরীর বাড়ি যেতে পারবে না। এক হয় যদি সন্ধ্যার বাড়ি দিনের বেলা বসা যায়।

শর্বরী মাথা নাড়ল, ''না, রিস্ক হয়ে যাবে। মন্মথ আগে থেকে খবর পেয়ে যেতে

সেটা একটু ভাল মতো বুঝে নেওয়া দরকার।''

সব শুনে সন্ধ্যা নিজেই রাগিণীকে বলল, ''পান্নাদের বাড়ি সবাই মিলে জড়ো হওয়া যেতে পারে। ওই বাড়ি একেবারে ফাঁকা পড়ে থাকে সারাদিন। মাসিমা শয্যাশায়ী, সে কথা বলে না, কিছু বোঝেও না, তার কাছ থেকে কোনও কথা লিক হবে না। তাছাড়া পান্না কারও সঙ্গে কথা বলতে কোথাও যাবে না। ওর বাড়িতে গিয়েই ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে।''

সেই মতো কিশোর, রাগিণী, শর্বরী, সন্ধ্যামণি পান্নাদের বাড়িতে বিকেলে মিট করল। পান্নাকে দেখলে এখন সকলেরই মায়া হবে। তার সঙ্গে ওদের সকলের মধ্যেই যেটা প্রবলভাবে দেখা দিল সেটা হল রাগ আর ঘৃণা, মন্মথর উপর।

পান্না কথা বলতে পারছিল না ভাল করে। মাথা নিচু করে সিচুয়েশনটা বোঝাচ্ছিল কিন্তু মূল অংশে এসে কেঁদে ফেলল। ওদের মধ্যে কিশোরও আছে, তাই বোধহয় তার লজ্জাটা বেশিই বোধ হল। ছুটে চলে গেল ভিতরে।

কিশোর গর্জন করে উঠল, ''মন্মথকে খুন করে ফেলাই উচিত আমাদের।''

সন্ধ্যা হাঁফিয়ে-হাঁফিয়ে বলল, ''এমন শাস্তি দিতে হবে যে জন্মের মতো শিক্ষা হয় কিন্তু প্রাণে মেরো না ওকে।''

''এই হল আমাদের সনাতনী নারী। সিঁদুরের দাম বড্ড বেশি তাদের কাছে। আরে, পুরুষটা তো সেই সিঁদুরের মূল্যটা আগে বুঝবে, নাকি?'' কিশোরের রাগকে থামিয়ে দিল রাগিণী, ''শোনো, মন্মথকে আমরা প্রাণে মারব না। কারণ সে জঘন্য অপরাধ করেছে কিন্তু হত্যা তো করেনি পান্নাকে। যদি প্রাণ নিত কারও তাহলে ওকে প্রাণ দিতে হত। সর্বোচ্চ অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি।'' শর্বরী বলল, ''এই কেসটা খুব সিরিয়াস ধরনের। মন্মথকে আমরা কোনও শাস্তিই দেব না। আমরা শুধু...''

শর্বরীর কথা শেষ হওয়ার আগেই অন্যরা হইচই করে উঠল, ''সে কী... সে কী... তাহলে আর এই মিটিংয়ের অর্থ কী?''

''কথাটা শেষ করতে দেবে তো, নাকি তার আগেই চেঁচামেচি করবে সবাই মিলে? দেখ পান্না তো আমাদের ডাকেনি। আমাদের ডেকেছে সন্ধ্যামণি। সে একা কিছু করতে পারছে না তাই আমাদের সাহায্য চায়। রাইট?''

''রাইট।'' কিশোর বলল। রাগিণীও মাথা হেলালো।

''আমরা মন্মথকে ধরে সন্ধ্যামণির হাতে তুলে দেব, শাস্তি যা দেবার সে-ই দেবে।

মন্মথর অপরাধ অনেক বড়। শাস্তিও বড় মাপের হবে। সেখানে ওদের অবস্থানটা কী হতে পারে?

১১

শর্বরী কফিতে চুমুক দিয়ে বলল, ''সন্ধ্যামণি আমাদের কাছে ঠিক কীরকম সাহায্য আশা করছে?''

''ও মন্মথকে শাস্তি দিতে চায়। পান্নার প্রতি কৃত অপরাধের কী শাস্তি হতে পারে শর্বরী?''

''নাবালিকা ধর্ষণের অপরাধে মন্মথর গায়ের ছাল তুলে নেওয়া উচিত কিন্তু সেখানে আইন কিন্তু নিজেদের হাতে নিতে হবে।''

''পান্না পুলিশে যায়নি, যেতে পারবেও না। আইন এখানে সুযোগ পাচ্ছে কোথায়? তাছাড়া মন্মথ যথেষ্ট ধড়িবাজ, সে বলেই দিয়েছে, সাক্ষী কোথায় পাবে?''

''হুঁ। আইন এখানে অসহায়। তাছাড়া শাস্তি দেবে মন্মথর বউ। সে দিতেই পারে। তার ষোলো-আনা অধিকার আছে শাস্তি দেওয়ার কিন্তু একা সে পারছে না,

পারে। তাছাড়া প্রতিবেশীরা পরে পুলিশ ইত্যাদির কাছে কী বলবে কে জানে। কাজটা এমন করে করতে হবে যাতে মন্মথ থানা পুলিশ না করতে পারে। সন্ধ্যাকে কোথায় পাওয়া যেতে পারে? ওর সঙ্গে না বসলে হবে না।''

''হুঁ, সন্ধ্যার ফোন নেই। ও নিজে আমাকে আজ রাতে ফোন করবে। কিন্তু করলেই বা কী, ওকে তো আর কফিশপে ডাকা যাবে না।''

''একটা কথা, একবার পান্নার সঙ্গে কথা বলে নিতে পারলে ভাল হত।''

''তুই কী ভাবছিস, সন্ধ্যা বানিয়ে বলতে পারে? মন্মথর বিরুদ্ধে ওর রাগ মেটানোর জন্য এইরকম একটা ঘটনার কথা উত্থাপন করছে?''

''না, ওকে দেখে ঠিক তা মনে হল না। তবে পান্নার সঙ্গে কথা বলা নিশ্চয়ই দরকার। যার উপর অন্যায়টা হয়েছে, যে অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমরা অ্যাকশন নিচ্ছি,

সন্ধ্যার কোনও ক্ষতি যাতে করতে না পারে মন্মথ, আমরা সেদিকে খেয়াল রাখব।''

''ব্যস ওতেই হবে।'' সন্ধ্যামণি ঘাড় হেলাল।

এর পর বসে পুরো প্ল্যান ছকে ফেলা হল। প্ল্যান শেষে কিন্তু দু'টো সমস্যা উঠে এল। এক, মন্মথকে যে শাস্তিই দেওয়া হোক তাকে দু'টো দিন অন্তত আটকে রাখতে হবে। দুই, মন্মথর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

সন্ধ্যামণি বিদ্বান না হলে কি হবে, যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। সে হেসে উঠল, তার হাসি দেখে সকলেই অবাক। এতে হাসির কী আছে। মন্মথকে আন্ডারগ্রাউন্ড করাটা হাসির কথা নয়। পাশাপাশি লোকজনের সাক্ষীর ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে।

সন্ধ্যামণি আবারও হাসল, ''বেড়াল পার করা দেখেছেন কখনও আপনারা?''

''বেড়াল?''

''হ্যাঁ, বস্তায় ভরে তাকে সমানে ঘোরানো হয়। একটা মাঠ ঘোরানো হয়, কিংবা পুকুর ঘোরানো হয়, এমনকী বড় গাছ থাকলেও ঘোরানো হয়। এত ঘোরানোর ফলে বেড়ালটা নিজের আস্তানার হিসেবটা হারিয়ে ফেলে। তারপর যে কোনও জায়গায় বস্তাটা খুলে দিলেই সে বেরিয়ে দৌড় লাগায়। যতখন ঘুরেছে সেই হিসাবে দৌড়তে থাকে। তারপর আন্দাজে যেখানে গিয়ে থামে, সেটা অনেক দূর হয়ে যায়। আর পুরনো জায়গায় ফিরে আসতে পারে না। একেই বলে বেড়াল পার।''

''এইখানে সেই বেড়াল পারের কথা আসছে কেন?''

''দাঁড়া না কিশোর, সন্ধ্যা যখন বলছে, নিশ্চয়ই কিছু যোগ আছে। বলো সন্ধ্যা।''

''আপনারা ওকে কোথায় পাবেন, বলেছি আমি। তারপর ওকে ধরা আপনাদের কাজ। নিশ্চয়ই চোখ বেঁধে দেবেন ওর?''

''তা তো দেবই।'' শর্বরী বলল, ''আমাদের চিনতে দেব না। এ তো মুকুল কেস নয়।''

''তারপর গাড়িতে হোক, ট্যাক্সিতে হোক, অনেকটা ঘোরাবেন। রাত যখন বেশ গভীর হবে, ওকে আমার বাড়ি নিয়ে আসবেন।''

''তোমাদের বাড়ি?'' রাগিণী চমকে গেল।

''হ্যাঁ, সবচেয়ে সুবিধেজনক, সবচেয়ে নিরাপদ, আমার কাজের সুবিধা হবে সেখানেই। গাড়ি থেকে নামানোর সময় দিদিরা নামবেন না। কিশোরদাদাবাবু ওকে নামাবেন, আর আমাকে ডেকে নেবেন। দু'জনে মিলে ওকে ঘরে নিয়ে আসব। মদে চুর হয়ে ওভাবে বাড়ি আসাটা এখানে সকলেই দেখতে অভ্যস্ত।''

রাগিণী আর শর্বরী হাসতে লাগল। কিশোরও যোগ দিল তাতে। সন্ধ্যা বলল, ''ভুল বললাম কিছু?''

''ভুল কি গো, আমাদের বাহিনীর সবচেয়ে বেশি তুখোড় সদস্য মনে হচ্ছে সন্ধ্যামণি। না, পরেও কাজে লাগবে একে। কী গো, শুনেছ তো আমাদের গ্রুপের কথা। কাজ করবে তো পরে গ্রুপের হয়ে।''

''করব না মানে? ডাকলেই ছুটে যাব।''

তখনকার মতো ভেঙে গেল সেদিনের সভার কাজ। সভা শেষ। কাল থেকেই অ্যাকশন শুরু।

১২

একটা সস্তার হোটেলে বসে মন্মথ মদ খাচ্ছিল। বেশ ভালই নেশা হয়ে গেছে ওর। কিশোর ছদ্মবেশ নিয়েছে আজ। ওর চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, গালে দাড়ি, কপালে আঁচিল। কব্জিতে ঘড়ি নেই, একটা তামার বালা পরা। প্যান্টের উপর মাল্টিকালারের চেক শার্ট। ও এসে মন্মথর পাশের টেবিলে বসল।

আগে থেকেই ঠিক আছে, কিশোর মন্মথর সঙ্গে কথা বলবে না। ও এসেছে শর্বরীর সেফটির জন্য। মন্মথ খারাপ লোক। শর্বরীরই এখানে কাজ, কিন্তু যদি মন্মথ কিছু বেকায়দা করে তখন কিশোর হাত লাগাবে। তবে যে রেটে মদ খাচ্ছে মন্মথ, ওর আর বেশি কিছু করার নেই।

একটা ফুল ছাপ-ছাপ সিনথেটিক শাড়ি পরে, চোখে মোটা কাজল এঁকে, পান খেয়ে ঠোঁট লাল করে শর্বরী এসে মন্মথর টেবিলে বসল। ওকে দেখে কিশোরের এত হাসি পেল যে চেপে রাখাই দুষ্কর। শর্বরীদি একটা স্কুলে কমার্স সাবজেক্ট পড়ায়, জুডো জানে, সত্যিকারের রুচিশীলা। ওরা যে এবার সত্যি-সত্যি একটা বড় কাজে হাত দিয়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে।

মন্মথ শর্বরীর দিকে তেরচা চোখে তাকাল। ওকে উসকে দিয়ে শর্বরী ঢঙ করে বলল, ''এই যে, খুব যে চড়াচ্ছ!''

''তুমি খাবে? আমার কাছে পয়সা আছে।''

''এইখানে?' ম্যা-গো!''

''তাহলে? গলির ধারের পার্কটায়?''

''ছিঃ-ছিঃ, আমার ঘরে চলো না।''

''অত টাকা নেই আমার।''

''পরে হিসেব করে দিয়ে দিও।''

কথা শেষ করেই শর্বরী ওর সস্তার হাতব্যাগটা ঠেলে নীচে ফেলে দিল। সেটা তুলতে মন্মথ যেই নিচু হল, শর্বরী হাতে লুকনো দু'টো ট্যাবলেট ওর গেলাসে ফেলে দিল।

ব্যাগটা তুলে মন্মথ টেবিলে রাখল। শর্বরী ন্যাকা সুরে বলল, ''যাবে নাকি?''

''যাব, দাঁড়াও। আগে এটা শেষ করি। পয়সা দিয়ে কিনেছি। ফেলব নাকি?'' এই বলে গ্লাস তুলে চোঁ-চোঁ চুমুক লাগাল মন্মথ।

''আমি তাহলে নীচে গিয়ে রিকশা ডাকি?''

''হ্যাঁ ডাকো। সটকে পড়ো না যেন। আমি আসছি।''

শর্বরী উঠে দাঁড়ানো মাত্র কিশোর দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়িতে চলে এল। জায়গাটা এত খারাপ, এক মুহূর্তের জন্যও শর্বরীকে একা ছাড়া যায় না।

''কী গো শর্বরীদি, রি-অ্যাকশন কেমন হবে, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে পারবে তো?''

''মনে হয় পারবে। যদি সিঁড়িতেই ঢলে পড়ে, তুমি নামিয়ে আনবে। আগে একটা ট্যাক্সি ঠিক করে এসো বাইরে, কুইক কিশোর।''

কিশোর বাইরে এসেই ট্যাক্সি পেয়ে গেল। রাতের দিকে পানশালাগুলোর বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়েই থাকে। একটার মিটার ডাউন করেই কিশোর ভেতরে ঢুকল। সিঁড়ির নীচে শর্বরী দাঁড়িয়ে আছে। ওপর থেকে টলতে-টলতে নামছে মন্মথ। নীচে এসেই টলে পড়ে যাচ্ছিল। কিশোর ধরে ফেলল। বোঝা গেল মন্মথ জ্ঞান হারিয়েছে, ওকে বাইরে নিয়ে এল ওরা। দুটো মাঝবয়সি লোক সেই সময় ভিতরে ঢুকছিল, ভুরু নাচিয়ে বলল, ''একেবারে আউট নাকি? ফিরবে কী করে?''

''আমি সঙ্গে আছি তো, নিয়ে যাব।''

কিশোর গম্ভীর হয়ে বলল। লোকগুলো শর্বরীকে দেখছিল, শর্বরী শাড়ি দিয়ে মুখটা আড়াল করল।

ওরা ট্যাক্সিতে মন্মথকে তুলে এক পাশে বসাল। মন্মথর কোনও জ্ঞান নেই। কিশোর ঠোঁটে আঙুল রেখে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে ইশারায় দেখাল। তারপর বলল, ''চলো, দাদাকে বাড়িতেই নিয়ে যাই।''

''তাই চলো। তুমি সাবধান, রাতে আবার ভাল দেখতে পাও না তুমি।''

''হুঁ।'' হাসি গোপন করল কিশোর।

ঠিক দশ মিনিট ট্যাক্সিটা সাউথের দিকে চলার পর কিশোর বলল, ''ব্যস-ব্যস এসে গিয়েছি। এখানেই রাখুন দাদা।''

ট্যাক্সি থেকে নেমে ওরা পথের ধারে দাঁড়াল। আর একটা ট্যাক্সি ধরতে হবে। একটু ছোটাছুটি করে শর্বরী ট্যাক্সি পেল একটা। কিশোর ততক্ষণে নিজের দাড়িটা খুলে মন্মথর গালে ফিট করে দিল। চশমাটাও পরিয়ে দিল ওকে। কিশোর

শার্টটা খুলে উলটে পরে নিল। হাতা গুটিয়ে রাখল।
এই ট্যাক্সিতে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে কিশোর বলল, "আর একবার ট্যাক্সি পালটাব, তারপর আসল জায়গায়। ওরা রিস্ক নিতে পারছে না। মন্মথ যদি পরে পুলিশে যায়, পুলিশ যদি বারটা থেকে ট্যাক্সির সন্ধান করে করে পৌঁছে যায় সেখানে?
এইবার এই ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়াল সন্ধ্যামণির বাড়ির কাছে। তার আগেই কিশোর মন্মথর দাড়ি-চশমা খুলে নিয়েছে। রাস্তায় বিশেষ লোকজন নেই। মন্মথকে ধরে নিয়ে কিশোর আর শর্বরী সন্ধ্যামণির বাড়ির গলিপথ ধরল, আর সোজা পৌঁছে গেল বাড়িতে।
সন্ধ্যা ইশারায় জিজ্ঞাসা করল, "জ্ঞান আছে?" রাগিণীও এখানে আছে। শর্বরী মাথা নাড়ল দু'জনের দিকে তাকিয়েই। সন্ধ্যা ওদের ঘরের পিছনে নিয়ে গেল। একটা ঘুপচি অন্ধকার ছোট ঘর। কয়লা-টয়লা রাখা হত, আরও অনেক অপ্রয়োজনীয় জিনিস। সে সব সরিয়ে বেশ খানিকটা জায়গা বের করা হয়েছে। সেখানে একটা খাটিয়া পাতা। খাটিয়ার পিছনে একটা বড় লোহার হুক। বোধহয় কিছু টাঙিয়ে রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। সেখানে নিয়ে বসিয়ে দেওয়া হল মন্মথকে।
সন্ধ্যা ফিসফিস করে বলল, "ওর চোখ বেঁধে দাও এখনই। হাতটাও বাঁধো, পিঠমোচড় করে, তার পরে সেটা ওই হুকে বেঁধে দাও। ওর গায়ে কিন্তু অসম্ভব জোর।"
শর্বরী বলল, "আজ আমি এখানেই থেকে যেতে পারি। তুই বাড়ি চলে যা।" রাগিণী মাথা হেলালো, কিশোরের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমাকে তুই পৌঁছে দিয়ে বাড়ি যাস। কাল আবার এখানে আসবি। ছুটি নিয়েছিস তো?"
কিশোর ঘাড় নাড়ল। কেউ এখানে নাম নেবে না কারও, আগেই ঠিক হয়ে আছে। আর সন্ধ্যা একবারের জন্যও কথা বলবে না, মন্মথর গায়ে হাত ছোঁয়াবে না।
শর্বরী বলল, "লোকটাকে কি আমি একটু শুইয়ে দিতে পারি? সারারাত তো আর বসে থাকবে না। দেওয়ালে হেলান দিয়েই না হোক শুয়ে থাক।"
রাগিণী বলল, "ওকে কি কিছু খেতে দেওয়া হবে? নাকি সারারাত না খেয়েই থাকবে?"
"প্রচুর চাট সহ ভরপেট মদ খেয়েছে ব্যাটা। আজ কিছু খেতে হবে না। কাল ভাবা যাবে। তাছাড়া কে খাওয়াবে ওকে? আমি পারব না।"
কথা শেষ করে শর্বরী নিচু হয়ে মন্মথকে ঠিক করে বসাতে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গে মন্মথ এক লাথি মারল শর্বরীকে। কখন ওর জ্ঞান এসেছে কেউ জানতে পারেনি। কিশোরের মাথায় রক্ত উঠে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে ওর পা বেঁধে ফেলল, তারপর কোমরের বেল্ট খুলে সপাসপ মারতে লাগল।
মারতে-মারতে যখন হাঁফিয়ে পড়ল তখন থামল কিশোর। ওকে কেউ বাধা পর্যন্ত দেয়নি। সকলেরই ইচ্ছে করছিল বোধহয় মারতে। এমনকী সন্ধ্যার চোখে-মুখেও বিন্দুমাত্র দয়া দেখা গেল না।
মন্মথর চোখ বাঁধা, মুখও। সে একটা টুঁ-শব্দ বের করতে পারল না। শুধু গলার মধ্য থেকে ঘড়ঘড় শব্দ বেরিয়ে এল। মার খেয়ে নেতিয়ে পড়েছে। ওভাবেই ওকে ওখানে রেখে সকলেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মোমবাতিটাও নিভিয়ে দেওয়া হল ফুঁ দিয়ে।
কিশোর আর একবার ওর বাঁধনগুলো চেক করে নিল। ঠিক আছে।
কুঠুরি ঘরের বাইরে কয়লার বস্তা, ঘুঁটের ঝুড়ি, তুলসীগাছের ভাঙা টব রেখে দিল সন্ধ্যা। দরজাটা একেবারে জ্যাম হয়ে গেল। বাইরে থেকে দেখলে বোঝার উপায় নেই যে ভিতরে কিছু আছে।

সন্ধ্যা ঘরে এসে চাপা গলায় কথা বলল, "দু'দিনের বেশি রাখা যাবে না ওভাবে। যদিও কেউ আসে না আমাদের বাড়ি, তবু বলা তো যায় না।"
রাগিণী চিন্তিত স্বরে বলল, "এক মুহূর্তের জন্যও ওর চোখ-মুখ, হাত-পা খোলা রাখা যাবে না।"
শর্বরী বলল, "কিশোর, আমাদের আগের প্ল্যান যেন মনে থাকে। আমি আর রাগিণী ফিসফিস করে কথা বলব কিন্তু তুই বলবি না। ও যেন না বোঝে যে আমাদের দলে কোনও ছেলে আছে। আর সন্ধ্যা, তুমি তো ওকে ছোঁবে না বলেছ, ছুঁলেই নাকি তোমাকে চিনে ফেলবে। তাহলে শাস্তি কী করে দেবে?"
"ওটা আমার উপর ছেড়ে দাও। শুধু একটা কথা, কাল ওকে খাওয়াতে হবে দুপুরে, হয়তো একটু পরিষ্কারও করতে হবে। কে করবে? আর একজন মহিলাকে জোগাড় করা যায়?"
রাগিণী বলল, "হ্যাঁ যায়। কাল আমি নিয়ে আসব তাকে। কিন্তু খুব সাবধানে রাতটা কাটাবে। যদি চেঁচায় বা শব্দ করে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে।"
"চিন্তা করিস না। আমরা পালা করে জেগে থাকব। কিশোর, ভাল করে বাঁধা হয়েছে তো?"
"ভীষণ ভাল করে বেঁধেছি। নড়তে পারবে না। তবে আর একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিলে হত।"
শর্বরী বলল, "না। দু'টো ওষুধ দিয়েছি। সেটাই কাজ করবে। তাছাড়া খাদ্য বেশি কিছু পেটে নেই। আবার ঘুমের ওষুধ দিলে মুশকিল আছে। ঠিক আছে তোরা এগিয়ে যা।"
রাগিণী বেরিয়ে গেল। শর্বরী মা'কে ফোন করল, "মা, আমি রাগিণীর বাড়ি আছি। চিন্তা কোরো না। কাল স্কুল করে বাড়ি যাব।"
শর্বরী কপিলকে বলেছে, দু'দিন বাপের বাড়ি থাকবে। আর মা'কে বলেছে, আমি রাগিণীর বাড়ি যাচ্ছি। এইটুকু চালাকি ওকে করতেই হয়েছে। বড় কাজের জন্য ছোট মিথ্যে বললে পাপ হবে না।
কিশোর আর রাগিণী ট্যাক্সিতে উঠল, "রাগিণীদি আর একজন মহিলাকে কোথায় পাবে? আমার দিদিকে বলব?"
"না। আমি দেখছি।" রাগিণী ঘড়ি দেখল। রাত হয়েছে, তবু ফোনটা করা যাবে, মানে করতেই হবে। লাকিলি সুহাসিনীই ফোনটা ধরলেন— "হ্যালো। আমি রাগিণী। আমাদের জন্য একটু কাজ করতে হবে এবার। পারবেন?"
"সানন্দে। তোমাদের ডাকের আশায় বসে আছি।"
"কাল সকাল আট'টা নাগাদ আনতে যাব, রেডি হয়ে থাকবেন। ডিটেলটা কাল বলব, দেখা হলে।"
"ঠিক আছে।"
শর্বরী আর সন্ধ্যামণি খাটে পাশাপাশি শুয়ে আছে। দোকান থেকে কিনে আনা রুটি আর তড়কা দিয়ে রাতের খাওয়া সেরেছে দু'জনে। বেশি খেতে পারেনি কেউই। ওই যেটুকু না খেলে নয়।
খাটে একটা পরিষ্কার কাচা চাদর পেতেছে সন্ধ্যা। ওর ঘর-টর এমনিতেই খুব পরিষ্কার। ওরা গরিব হয়তো কিন্তু ঘরে কোথাও মলিনতার ছাপ নেই। বাসন, জানলা-দরজা, মেঝে সবই পরিষ্কার ঝকঝকে। আসবাব ঘরে সত্যিই কম, কিন্তু যেটুকু আছে একেবারে গোছানো। আলনায় কম কাপড় বলেই বোধহয় পরিপাটির খামতি নেই।
সন্ধ্যার ঘরে ইলেকট্রিসিটি আছে। ফ্যানও ঘুরছে, আলোও জ্বলছে। সন্ধ্যার অনেক কাছের লোক হয়ে গিয়েছে শর্বরীরা, তাই কখন যেন আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে ও।
সন্ধ্যা পাশে শুয়ে থাকা শর্বরীকে বলল,

"দিদি, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। আমি জেগে আছি।" আলোটা নিভিয়ে দিল ও।
শর্বরী তাকাল সন্ধ্যার দিকে। বাড়ির এই পরিস্থিতিতে ঘুমনো প্রায় অসম্ভব, দু'জনের পক্ষেই। সন্ধ্যা বলল, "তোমার কষ্ট হচ্ছে শুতে? একটা রাত, একটু সহ্য করে নাও দিদি।"
শর্বরী এই কথাটা শুনতে পেল না বোধহয়, কারণ ও যে কথাটা বলল, সেটার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে তো ছুটি কাটাতে আসেনি, বেড়াতেও আসেনি ও। খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ করতে এসেছে। ঝটিকা বাহিনী এই ধরনের কোনও কাজ করেনি এখনও পর্যন্ত।
"সন্ধ্যা, মন্মথর উপর তোমার যে রাগটা সেটা কি পান্নার জন্যই? সে জন্যই কি ওকে শাস্তি দিতে চাইছ?"
"পান্নার ঘটনাটা না ঘটলে আমি কিচ্ছু করতে যেতাম না। যেমন চলছিল, তেমনই চলত। সত্যি করে বলতে কী, আমার উপর ও যে অত্যাচার করেছে বা করে, সেটা তো আমার টাকা রোজগারের পর থেকে একটু কমেছেই। আগে তো নিজস্ব মত বা ইচ্ছে কাকে বলে জানতামই না, এখন সেটুকু বলতে পারি। শুনুক না শুনুক সেটা পরের কথা।"
"তুমি কী লেখাপড়া জানো সন্ধ্যা?"
"পাশ-টাশ দিইনি তবে 'ক লিখতে কলম ভাঙি', তেমনও নয়। স্কুলে পড়েছি। বোধ-বুদ্ধিও ছিল। গরিবের বাড়ি, সম্বন্ধ এসে গেল, দিয়ে দিল বিয়ে। আমি মনে করলাম বিয়ে মানে না জানি কী! সে একটা দারুণ ব্যাপার বুঝি। সিনেমা দেখে নায়িকাদের নকল করার বয়স তখন। জীবনে আর সিনেমায় যে কত তফাত তখন তো বোঝা যায় না।"
"তুমি কি কোনও দিনই সুখী হওনি সন্ধ্যা? মন্মথ ভালবাসেনি একদিনও?"
"সুখী?" শব্দটা নিয়ে মুখের মধ্যে খানিকটা পাকলালো সন্ধ্যা। কোনও স্বাদ পেল না, বলল, "পেটভরে খাওয়ার নাম যদি সুখ হয় তাহলে হয়েছি। মন্মথ খেতে দিত ঠিকঠাক। আর ওর মা, আমার শাশুড়ি, কোনও দিন আমার পিছনে লাগেনি। কী আর লাগবে? ছেলে তো রেগে গেলে বউকে মারেই, মা'কেও ছেড়ে দিত না। মনটাকে ঘরের বাইরের ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে এসে যদি সংসার করতে পারা যায় তাহলে অনেক মেয়েকেই তো সুখী বলতে হবে। মান-সম্মান-বিসর্জন, অনিচ্ছায় শরীর নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দেওয়ায় যদি অভ্যেস করে ফেলা যায়, তাহলে সুখী-টুখি ভাবা যেতে পারে।"
"তোমাকে কি প্রথম থেকেই মারত মন্মথ? আদর সোহাগ কখনও করেনি?"
ভুসভুসিয়ে হেসে উঠল সন্ধ্যা, স্মৃতির ঝাঁপি যেন উপড়ে চলে এল হাতের চেটোয়। বলে উঠল, "বিছানার উপর কাজের সময় কোন পুরুষ না সোহাগ-টোহাগ করে? তারপর সব মিটে গেলে পা দিয়ে ঠেলে বিছানা থেকে ফেলে দিতেও দেরি হয় না।" শর্বরী চুপ করে ছিল। সন্ধ্যার কথাগুলো খুব নগ্ন বটে কিন্তু চিত্র বোধহয় অনেক জায়গাতেই এক। তথাকথিত শিক্ষিত-সভ্য, সমাজের উঁচুতলার মানুষগুলো শুধু তাদের আচরণে একটু পোশাক পরিয়ে নেয়।
শর্বরী বলল, "মন্মথকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার তোমার নিশ্চয়ই আছে, একমাত্র তোমারই সবচেয়ে বেশি আছে। আমরা তোমাকে সাহায্য করতেই এসেছি। তা ছাড়া পান্নার ধর্ষককে উপযুক্ত শাস্তি আমরা দিতেই চাই। সোজা পথে হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে ঘুরপথকে অবলম্বন করতে হল। পান্না পুলিশে যাবে না, আর গেলেও সাক্ষী নেই কোনও। কিন্তু তুমি আমাদের এখনও বলনি, তুমি ওকে কী শাস্তি দেবে?"
"চিন্তা কোরো না, ওকে প্রাণে মারব না। তবে এমন শিক্ষা দেব যে সাতজন্মেও ভুলবে না।"
"আমি ঝটিকা বাহিনীর সকলকে একটা কথা বার-বার বলি, সেটা হল আমরা কিন্তু কোনও ক্রাইম করব না। তোমাকেও বলছি।"
"আচ্ছা। কিন্তু তুমি ঘুমিয়ে নাও দিদি। কাল অনেক কাজ আছে। ভালই হল এই সব কথা আলোচনা করে। আমার বুকের মধ্যে অনেক বারুদ আমি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম, সেগুলো উসকে উঠল। অনেক চোখের জল ফেলেছি, অনেক অপমান, অসম্মান, মার সহ্য করেছি। আজ আমার পালা।"
শর্বরী চোখ বন্ধ করল। ও ঘুমোবে না, কিন্তু একটু বিশ্রাম বোধহয় দরকার। কনসেনট্রেশনেরও।

১৩

রাগিণী ও কিশোর সকাল সাড়ে আট'টার মধ্যে সুহাসিনীকে নিয়ে ঢুকল। প্রতিবেশীরা যাতে কোনও রকম সন্দেহ না করে তাই অন্যান্য দিনের মতো উনুন জ্বেলেছে সন্ধ্যা। চা বসিয়েছে।
কিশোর কয়লা কুঠরির দিকে ইশারা করল, "ওদিকে কী খবর?"
শর্বরী আস্তে-আস্তে গিয়ে দরজাটা একটু ফাঁক করল। ভিতরে উঁকি দিয়ে জানাল, "ঠিক আছে।" সবাই ভিতরে ঢুকল। মন্মথর বাঁধনগুলো চেক করল কিশোর। মন্মথ জেগে আছে। সুহাসিনী বাইরে থেকে কিনে আনা চা আর কেক হাতে এগিয়ে গেলেন। এবার মন্মথকে খাওয়াতে হবে। শর্বরী বলেছে, "কোনও ঘরোয়া খাবার ওকে দেওয়া যাবে না। ঘুণাক্ষরেও যেন না বোঝে কোথায় বন্দি আছে। সব সময় কেনা খাবার আর ভাল খাবার দেবে। ওকে যে কেন বন্দি করা হয়েছে, কে বন্দি করেছে, কিছুতেই যেন আন্দাজ করতে না পারে।'
রাগিণী কিশোরকে শিখিয়ে দিল, "মুখ

খোলার সময় খুব সাবধান, চেঁচাতে পারে। এই প্রথম মুখ খুলছি ওর আমরা। যদি চেঁচায় সঙ্গে-সঙ্গে আবার এঁটে দেবে।''
কিশোর মন্মথর মুখের বাঁধন খুলতেই মন্মথ একটা অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিল। কিশোর আবার মুখের বাঁধন দিয়ে দিল। সন্ধ্যা দৌড়ে গিয়ে উঠোনের কল খুলে দিয়ে এল। রাগিণী ঘরের মধ্যের রেডিওটা জোরে চালিয়ে দিল। শর্বরী ফিসফিস করে শাসানি দিল, ''তুমি যদি একটিও শব্দ করো মুখে, তাহলে স্রেফ না খেতে দিয়ে মেরে ফেলব তোমাকে। একটা বিশেষ কাজের জন্য তোমাকে আনা হয়েছে। চুপ করে থাকো, দেখতেই পাবে।''
শর্বরী মন্মথর মুখের বাঁধনটা নিজেই সরাল, মন্মথ আবার গালি দিল, তবে চিৎকার করে নয়। ঠাসঠাস করে ওর দু'গালে দু'টো চড় মারল শর্বরী। আর ইশারা করল মাসিমা'কে।
সুহাসিনী এগিয়ে এসে ওকে কেক আর চা খাইয়ে দিলেন। চায়ে ঘুমের ওষুধ ছিল। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল মন্মথ।
বাইরের ঘরে সকলে এসে বসল।
রাগিণী গম্ভীর মুখে বলল, ''সন্ধ্যা, আজই তোমাকে কাজটা করে ফেলতে হবে।''
''জানি, আজই করে ফেলব।'' শর্বরী বলল, ''তার আগে ওকে ভাল করে খাওয়াতে হবে। সন্ধ্যা, মন্মথ কী খেতে ভালবাসে?''
''মদ আর বিরিয়ানি।''
''ওকে মদ আর বিরিয়ানিই খাওয়াতে হবে পেট ভরে সন্ধেবেলায়। কিশোর, ব্যবস্থা করতে পারবে?''
''তা পারব। কিন্তু ওই শয়তানটাকে মদ-বিরিয়ানি খাওয়াবে?''
''হ্যাঁ। কারণ আছে। তবে খাওয়ানোর সময় আমরা সবাই উপস্থিত থাকব। ও বদমায়েশি করতে পারে।''

এবেলা মন্মথকে আর খাওয়ানোর ঝামেলা করবে না ওরা।
থাকুক ওভাবে।
শর্বরী আজ বাড়ি যাবে। রাগিণী থেকে যেতে চাইল সন্ধ্যার সঙ্গে।
সন্ধ্যাকে একা রেখে যেতে ওরা ভরসা পাচ্ছে না।
সন্ধ্যা একটু কিন্তু-কিন্তু মুখ করে বলল, ''আমাদের দু'জনের জন্য রাঁধব তাহলে রাগিণীদি। ঝাল দেব না, খেতে পারবে।''
''আমি সব খেতে পারি, তার জন্য নয়। তবে শুধু ঝোল-ভাত। মন নেই।''
কিশোর কাল ছুটি নিয়েছিল। আজ অফিস যাবে। যাবার আগে মাসিমা'কে নামিয়ে দিয়ে যাবে, আবার আসার সময় নিয়ে আসবে। সকলে মিলে অফিস স্কুল কামাই করে কী হবে?
''তাহলে মন্মথর জন্য খাবারটা আনতে পারবে কিশোর?''
''পারব রাগিণীদি। তোমরা সাবধানে থেকো।''

সন্ধ্যা বলল, ''পেটভরে খাওয়ার নাম যদি সুখ হয় তাহলে হয়েছি। মন্মথ খেতে দিত ঠিকঠাক।''

১৪

খুব আশ্চর্য ঘটনা হল এই যে মন্মথ একরকম চুপচাপই বিরিয়ানি আর মদ খেয়ে নিল। আগে মদ পরে বিরিয়ানি। মদ খাচ্ছিল এমনভাবে যেন মরুভূমিতে জল পড়ছে। সুহাসিনী দুটো গাল শক্ত করে ধরে গ্লাস থেকে ঢেলে দিল ওর মুখে, বেশ কয়েকবার।
দুপুরে তো খেতে দেওয়া হয়নি। খিদের মুখে গপগপ করে খেয়ে ফেলল। তারপর মাথা দিয়েই সুহাসিনীকে একটা আঘাত দেওয়ার চেষ্টা করল। মাথা সরিয়ে নিলেন তিনি, তারপর বললেন, ''তুই এত বদমাশ! যে খাওয়াচ্ছে, তাকেই মারার চেষ্টা করছিস।''
মন্মথ বলল, ''বাঁধনটা যদি খুলতিস একবার, তাহলে দেখিয়ে দিতাম তোদের মতো মেয়েছেলেগুলোকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয়।'' এই বলে একটা খারাপ গালাগালি দিল। রাগিণী বলল, ''আর একটা কথা বললে তোমাকে ছিঁড়ে ফেলব। টুকরো-টুকরো করে ফেলব। মেয়েদের নোংরা কথা বলতে বাধে না?''
মন্মথকে মারার ইচ্ছে ছিল না শর্বরীর কিন্তু ভীষণ রাগ হয়ে গেল। পাশে একগাদা নারকোল দড়ি ছিল, সেটাই চাবুকের মতো চালাল। ওর মুখে আগেই সেলোটেপটা এঁটে দিয়েছিলেন সুহাসিনী।
রাগিণী সন্ধ্যাকে ইশারায় বলল, ''ঘুমের ওষুধ দিয়ে দেব?''
সন্ধ্যা 'না' বলল।
''জল?''
সন্ধ্যা ইশারা করল, ''আমি দেব পরে।''
কিশোরকে আর একবার বাঁধনগুলো দেখে নিতে বলল সন্ধ্যা। তারপর সবাইকে নিয়ে ঘরটার বাইরে বেরিয়ে এল। সন্ধ্যা ঘরে এলে কিশোর বলল, ''এবার তোমার প্ল্যান বলো সন্ধ্যাদি। শাস্তিটা কীভাবে দেবে? আমরা তোমাকে সাহায্য করি?''
''না, কাজটা আমিই করব। পরে বলব তোমাদের। দিদিরা তোমরা চলে যাও, মাসিমাও যান। শুধু কিশোরদাদা থাকুক। অনেক রাতে বেহুঁশ লোকটাকে গলির মোড়ে ফেলে দিয়ে আসতে হবে। আমি ভোরবেলা ওকে দেখতে পেয়ে কারও সাহায্য নিয়ে ঘরে নিয়ে আসব। কেউ কোনও সন্দেহ করবে না।'
সন্ধ্যার মুখটা কঠিন লাগছে, বড্ড বেশি কঠিন।
রাগিনী আর শর্বরী চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। সুহাসিনী বললেন, ''সন্ধ্যা তোমার কাছে আমি আজ থেকে যাই। মলয়কে ফোনে বলে দেব যে রাগিনীর বাড়ি আছি।''
'' না, দরকার নেই। আমি একাই থাকতে চাই। কিশোরদাদা, তুমি আজ বাইরে থেকে খেয়ে এস। আমি কিছু খাব না। আজ তো আমার ব্রত উদ্যাপনের দিন। তাছাড়া রান্নাও করতে ইচ্ছে করছে না।
ওরা চারজন বাড়িটা থেকে বেরিয়ে পড়ল। প্রত্যেকে প্রচণ্ড উত্তেজনায় ভুগছে। কী হবে, কী করবে সন্ধ্যা, শেষ পর্যন্ত সামলাতে পারবে তো?

আর একটু রাতে সন্ধ্যা চলল কয়লা কুঠরিতে। কিশোর বলল, ''আমি আসব সন্ধ্যাদি?''
''না, ছিঃ। শত হলেও স্ত্রী স্বামীর গায়ে হাত তুলবে, এ দৃশ্য কি অপরকে দেখতে আছে?''
''তুমি পারবে? আমার ভয় করছে।''
''ও আমার পান্নাকে নষ্ট করেছে, ওকে শাস্তি দিতে পারব না? যার স্বামী ধর্ষক,

তার বউয়ের মনের মধ্যে কেমন আগুন জ্বলে, তুমি জান না।"
সন্ধ্যা রান্নাঘরে ঢুকল। কিছু একটা নিল ঝুড়ি চাপা দিয়ে। আর কয়লা ভাঙার লোহাটা ন্যাকড়া জড়িয়ে তুলে নিল। কয়লা কুঠরির দরজা খুলে ভিতরে চলে এল সন্ধ্যা। ভিতরে মোমবাতিটা জ্বলছে। ওষুধের পুরিয়া আর একটা জলের বোতল আগে থেকেই রয়েছে সেখানে। সন্ধ্যা বুঝল, মন্মথর পুরো জ্ঞান আছে।
একবার ও ভাবল, ওষুধটা আগে দিয়ে নিলে ভাল হত। শাস্তিটা বুঝতে পারত না মন্মথ। পরে বুঝত। তারপর ভাবল, না। পান্নার হাউহাউ কান্না মনে পড়ল। ওকে বলেছিল, "সন্ধ্যাপিসি, তুমি একবার দেখবে কী করেছে লোকটা? ছিঁড়ে-খুঁড়ে থেঁতলে দিয়েছে গো। আমি বসতে শুতে পারছি না। বাথরুমেও যেতে পারছি না।" পান্নার মুখ চোখের জলে ভেসে যাচ্ছিল। কী কষ্ট যে পেয়েছে মেয়েটা! তাহলে? জ্ঞানত অবস্থাতেই ওকে সাজা দিতে হবে। কেমন কষ্ট হয়, নিজে ভোগ করুক।
কসাই নিজে আজ কবলে পড়েছে।
তাছাড়া কত দিনের পুঞ্জীভূত রাগ! কত অত্যাচার সহ্য করা শরীর-মন! আজ আর দয়া কিসের? একটুও না ছুঁয়ে কায়দা করে সন্ধ্যা মন্মথর পোশাক খুলে নিল। তারপর শুরু হল ওর কাজ...
কিশোর ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে পায়চারি করছে।
একসময় কয়লা কুঠরি বন্ধ করে সন্ধ্যা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল।
কিশোর দেখল, সন্ধ্যা ঘামছে দরদর করে। চোখ মুখ শক্ত। দৃষ্টিটা একেবারে ঘোলাটে। কিশোর এগিয়ে এল, ফিসফিস করে বলল, "তোমার শরীর খারাপ লাগছে?"
"দিয়েছি শাস্তি। সারাজীবন মনে থাকবে।" ঘড়ঘড়ে গলা সন্ধ্যার।
"মন্মথ মরে যায়নি তো?"
মাথা নাড়ল সন্ধ্যা— "না, মরে যায়নি।" তারপর ঝুপ করে নীচের বিছানার উপর পড়ে গেল। উপুড় হয়ে কাঁদতে লাগল ফুলে-ফুলে। সন্ধ্যার বুকের মধ্যে তুফান চলছে। ওই লোকটাকে বিয়ে করেছিল সন্ধ্যা। ভালও বেসেছিল একদিন। তারপর সব ভালবাসা ঘৃণায় জমাট বেঁধেছে। আজ সেই ঘৃণার নদীর মধ্যে মাথা কুটে মরছে সন্ধ্যামণি।
কিশোর আর একটাও কথা বলল না। সন্ধ্যা কথা বলার অবস্থায় নেই।
আলো নিভিয়ে কিশোর খাটের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ল।
ওরা হয়তো পরে জানতে পারবে সব। ঝটিকা বাহিনী এত দিনে সাবালক হল।
তখন রাত তিনটে।
কিশোরকে ডাকল সন্ধ্যা। এক ডাকেই উঠে পড়ল কিশোর। ওরা আলো জ্বালল না। কয়লা কুঠরিতে চলে এল দু'জনে।
সন্ধ্যা বলল, "আগে দেখো, অচেতন কিনা।"
কিশোর সবচেয়ে আগে গিয়ে মন্মথর শরীরে হাত রাখল, ওর ভয় করছিল, বেঁচে আছে কি না? নাকের নীচ থেকে হাত সরিয়ে বুকে রাখল, হ্যাঁ সেটাও ধুকপুক করছে। মন্মথ বেঁচে আছে নিশ্চিন্ত হয়ে ওকে পরীক্ষা করল। তারপর সন্ধ্যাকে ইশারায় বলল, কোনও জ্ঞান নেই।
তারপর সব বাঁধন খুলে ফেলা হল। দ্রুত হাতে যে পোশাকে এখানে এনেছিল সেই পোশাক পরানো হল। তারপর দু'জনে মিলে সাবধানে ধরাধরি করে ঘরের বাইরে আনল। সন্ধ্যা বলে রেখেছিল কিশোরকে। সে যেন কোনও মতে মন্মথর শরীরটা টেনে নিয়ে গিয়ে বাড়ির কাছাকাছি ফেলে রেখে চলে যায়।
"পিছন ফিরে তাকাবে না কিশোরদাদা, আমার কথা ভাববে না। তুমি সাবধানে চলে যাবে। আমি সকালবেলা ঠিক কারও সাহায্য নিয়ে বাড়ি নিয়ে আসব ওকে।"
"আমরা খবর পাব কী করে। বেলার দিকে আসব? মন্মথ তো আমাকে চেনে না। গলাও শোনেনি।"
"একেবারে আসবে না। তোমরা চারজন আর কোনও দিন আমার বাড়ি আসবে না। আমি নিজেই তোমাদের সব জানাব।"

সকালবেলা, ভাল করে আলো ফুটতেই, সন্ধ্যা পৌঁছে গেল মন্মথর পাশে, একজন পথচারীকে অনুরোধ করল, তার স্বামীকে একটু ঘর অবধি নিয়ে যেতে সাহায্য করতে।
লোকটা বলল, "তোমার স্বামী পথে পড়ে কেন?"
"এ কী নতুন? কোথায় মদ গিলে এসে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল। ওর ইয়ার বন্ধুরা ঘরের বাইরে ফেলে রেখে পালিয়েছে।" চিত্রটা সত্যিই সাধারণ। অবিশ্বাসের কিছু নেই। লোকটা মন্মথকে ধরে আনতে সাহায্য করল।
বিছানায় শুইয়ে দিল সন্ধ্যা ওকে। তখনও ও অচেতন।
তারপর আরও পাঁচটা দিনের মতো সংসারের কাজ করতে লাগল। আর একটু বেলায় মন্মথর জ্ঞান এল। সে কাঁদতে-কাঁদতে চেঁচাতে লাগল "আমি কোথায়? আমি কোথায়?"
সন্ধ্যা কাছে এসে চোপা করল, "চেঁচাচ্ছ কেন? বাড়িতে তুমি। রাস্তায় মদ খেয়ে পড়েছিলে, আমি তুলে এনেছি। দিন-দিন অধঃপাতে যাচ্ছ তুমি।"
"না-না, মদ খেয়ে পড়ে থাকিনি। আমাকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছিল। আমাকে শেষ করে দিয়েছে।"
"দেখ, কাঁদছ কেন? তোমার বুঝি নেশা কাটেনি? ঠিক আছে যা খুশি করো। আমি কাজের বাড়ি চলে যাচ্ছি। রান্না থাকল, খেয়ে কারখানায় চলে যেও।"
"না-না, সন্ধ্যা যেও না। আমাকে তুমি বাঁচাও। দেখ আমার কী অবস্থা করেছে ওরা। ডাক্তার ডাকো, ওষুধ দাও।"
"আ মরণ। শুয়ে-শুয়ে কাতরাচ্ছে, ওঠো না। কলতলায় যাও। হাত মুখ ধোও। ডাক্তার ডাকার সময় নেই আমার। নিজেই চলে যেও।"
উঠতে চেষ্টা করল মন্মথ, পারল না। কঁকিয়ে বলে উঠল, "আমার পা ওরা ভেঙে দিয়েছে। আরও দেখ কী করেছে!"

বাজার থেকে ওষুধ কিনে আনল কয়েক রকমের সন্ধ্যা। আর প্রচুর গালি দিতে লাগল মন্মথকে। মন্মথ হাত জোড় করে কাঁদতে থাকল, "আমাকে বাঁচাও।"
প্রচণ্ড রেগে উঠল সন্ধ্যা, "আমি বাঁচাব? যে সব মেয়েদের সর্বনাশ করেছ তাদের কথা ভাবো। কারা ধরে নিয়ে গিয়ে এই দশা করেছে? যারা করেছে, বেশ করেছে।"

সন্ধ্যা মন্মথকে খেতেও দেয়। ওষুধপত্রও দেয়। ডাক্তার ডাকেনি শেষ পর্যন্ত। এ যে বড় লজ্জার। মন্মথ যখনই বলে তিন-চারটে মেয়ে তার এই দশা করেছে তখনই সন্ধ্যা ভীষণ রেগে ওঠে, "মিথ্যে কথা বলবে না।"
"কী জানি, ওদের দলে ছেলেও ছিল কিনা।" সন্ধ্যাকে রাগায় না মন্মথ। মাঝে মাঝেই সন্ধ্যা ভয় দেখায়, "রাস্তায় বের করে দেব। শিয়াল-কুকুরে খাক তোমাকে। মনে নেই, আমার পান্নার কী দশা করেছিলে তুমি? ওরকম কত জন পান্নার কাহিনি আছে তোমার কে জানে?"
মন্মথ শুধু অপেক্ষা করে কবে সে সুস্থ হবে। আদৌ কি সুস্থ হবে কোনও দিন? খুঁজে বের করবে সে ওই মেয়ের দলটাকে। সন্ধ্যা রাগিণী আর শর্বরীর সঙ্গে ফোনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে। ওরা সব শুনে প্রথমে চমকে উঠেছিল, "এই শাস্তি দিলে?"
"হ্যাঁ। ধর্ষকের এই হল শাস্তি। জীবনে আর কোনও মেয়েমানুষের শরীরে ঢুকতে পারবে না। ভাঙা পা নিয়ে চলতেও পারবে না বেশি। বেঁচে থাকবে। বাঁচবে আর কষ্ট

পাবে। সারাজীবন কাঁদবে।''
''তাও ভাল, আমরা তো ভয় পেয়েছিলাম, তুমি মন্মথকে মেরেই না ফেলো। মাসিমা, কিশোর, সবাই ভয় পেয়েছিল।''
''মারতাম। যদি পান্নাকে প্রাণে মারত ও, তাহলে শেষ করে দিতাম।''

প্রায় এক মাস কেটে গিয়েছে। মন্মথর জখম অনেকটা সেরে এসেছে। তবে হাঁটতে পারে না ভাল করে। দুটো হাঁটুই নড়বড় করে। লাঠিতে ভর দিয়ে কোনও মতে যেদিন প্রথম বেরোল, সেদিন ও আগে কারখানায় গেল।
কারখানায় গিয়ে দেখল, ওর জায়গায় মালিক নতুন লোক নিয়ে নিয়েছে। অনেক দরবার করার চেষ্টা করল মন্মথ কিন্তু কোনও কাজ হল না। না বলে কয়ে এত দিন কামাই, মন্মথ ভাবল, কী করে ওর চাকরি অক্ষত থাকবে! মালিক একরকম বের করেই দিল মন্মথকে। কিছু টাকা ওর পাওনা ছিল, সেটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে তাড়িয়ে দিল।
সে টাকা অবশ্য সন্ধ্যা নিজের কাছে রেখে দিল। মন্মথর হাতে থাকলে তো মদ খেয়েই শেষ করে দেবে। তাছাড়া সংসার তো এখন সন্ধ্যার রোজগারেই চলে। কী'ই বা বলবে মন্মথ?
মন্মথর বুকের মধ্যে আগুন জ্বলে। কীভাবে ব্যাপারটা করল ওরা? কে করল? খুঁজে বের করতেই হবে। উপায় কী? একটা উপায় তো বের করতেই হবে।
একদিন লাঠি ঠুকে-ঠুকে মন্মথ থানায় গেল। সে একটা কেস লেখাতে চায়। থানার অফিসার বলল, ''আপনার অভিযোগটা বলুন।''
মন্মথ যতখানি সম্ভব গুছিয়ে কথাগুলো বলল।
অফিসার হেসে উঠল, ''আষাঢ়ে গপ্পো শোনাচ্ছেন? না ইয়ার্কি?''
''আমি সব সত্যি কথা বলছি।''
''রিয়েলি? সব সত্যি? কয়েকটা মেয়ে আপনাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে বেঁধে রেখে আপনার পুরুষাঙ্গটি আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছে? আবার ভারী কিছু দিয়ে মেরে আপনার হাঁটুও ভেঙে দিয়েছে। মেয়েরা?''
''হ্যাঁ সত্যিই তাই।''
''কেন? মেয়েগুলোর আপনার উপর কী রাগ?'' চোখ নাচাল অফিসার, ''ক'টা রেপ কেস আছে আপনার বিরুদ্ধে?''
''মানে-মানে আমি...''
''হ্যাঁ আপনি। তারা সবাই দলবেঁধে এটা করেনি তো?'' হাসছিল অফিসার।
''সত্যি-সত্যি করেছে। ডাক্তার দেখাতে পারেন কিংবা আমার বউকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। কী অসহ্য কষ্ট যে দিয়েছে ওরা আমাকে।''
''শাস্তিটা কিন্তু জব্বর দিয়েছে, যাই বলেন। তা আপনি বাধা দিলেন না?''
''বেঁধে রেখেছিল যে।''
''আহা! নেকু, শুধু বেঁধে রেখেছিল,ভাল মন্দ খাওয়ায়নি? ?''
''হ্যাঁ। বিরিয়ানি আর মদ খাইয়েছে।''
''চুপ করুন।'' চিৎকার করে উঠল অফিসার। ''এই কে আছিস, এই মাতালটাকে বের করে দে তো। যা খুশি বানিয়ে-বানিয়ে বলছে। ঘাড় ধরে বের করে দে।'' দু'জন পুলিশ মন্মথকে টেনে বাইরে নিয়ে গেল। বেরিয়ে যাওয়ার সময়ও মন্মথ বলতে লাগল, ''বিশ্বাস করুন স্যর, সত্যি বলছি আমি।''

সন্ধ্যার বাড়ির ছবি পালটে গিয়েছে। ভাঙা হাঁটু নিয়ে মন্মথ ভাল করে চলতে ফিরতেই পারে না, কাজ করবে কোথায়? আর তাকে কাজ দেবেই বা কে? বাড়িতেই পড়ে থাকে। সন্ধ্যার রোজগারেই সংসার চলে। মেজাজ তার চড়েই থাকে সব সময়। স্বাভাবিক। যে খাওয়াবে পরাবে সে তো একটু মেজাজ দেখাবেই।
এখন সন্ধ্যা খাটে শোয়। নীচের বিছানায় শোয় মন্মথ। মেয়েমানুষের কাছে শোওয়া ঘুচে গেছে তার। শোওয়ার আগে প্রায়ই সন্ধ্যা মন্মথকে এক ঘা ঝাঁটার বাড়ি মারে। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে, ''নখদন্তহীন বাঘের উপর বিড়ালের ফ্যাচফ্যাচানি, কেমন লাগে?''

১৫

''পান্নাকে নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে।'' রাগিণী বলল।
''কেন? তার তো এত দিনে সুস্থ হয়ে যাওয়ার কথা।'' কিশোরের বক্তব্য।
''কিসের সমস্যা রাগিণী?'' মূল কথায় ফিরে এল শর্বরী।
রাগিণী, শর্বরী, কিশোর, আবার একসঙ্গে একদিন এসে মিলেছে। ওরা একটা কফিশপে বসে আছে। আজ রবিবার, তিনজনেরই ছুটি। এর মধ্যে কোনও-কোনও রবিবার অবশ্য কিশোরের অফিস থাকে, কিন্তু শর্বরী আর রাগিণীর ছুটি।
''পান্না স্থির করেছে যে, প্লাস্টিক সার্জারি করে ও পুরুষে পরিণত হবে। একবার তার জীবনে যা হয়েছে, ভবিষ্যতেও আবার সেরকম হবে না, তার কী গ্যারান্টি আছে? তার চেয়ে মেয়ে হয়ে থাকারই আর দরকার নেই।''
''সে কী?'' শর্বরী অবাক, কিশোরও।
''হ্যাঁ, সন্ধ্যা আমাকে ফোনে বলেছে। ওর খুব মন খারাপ।''
''তার মানে পান্না পুরো সারেনি এখনও। শরীরের ক্ষত হয়তো শুকিয়েছে কিন্তু মেন্টাল ট্রমা থেকে এখনও বেরোতে পারেনি। নিজের শরীরটাকেই অপছন্দ করছে।''
''ওর একটা ভাল কাউন্সেলিং দরকার।'' কিশোর চুপচাপ ছিল। চোখ বড়-বড় করে শুনছে। এই সব ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা নেই। তবে পান্না যে জেন্ডার চেঞ্জ করে ফেলতে চাইছে, এতে সে রীতিমতো অবাক হল। একটা বড় অপরাধ কী ভীষণ প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে কারও জীবনে ভেবে দুঃখে ভরে গেল মনটা। সেদিন আরও কয়েক-ঘা কেন মারল না মন্মথকে সে কথা ভেবে আপশোস হল। বলেও ফেলল সে কথা।
রাগিণী বলল, ''তুই আরও দু'এক ঘা দিলে আর কী বেশি জব্দ হত? আসল জব্দ তো সন্ধ্যা করেছে।''
''সত্যি, আমি ভাবতে পারিনি সন্ধ্যা এরকম একটা স্টেপ নিতে পারে। কী আর ওর এমন শিক্ষা-দীক্ষা? আসল ব্যাপারটা কী জানিস, বোধ আর বুদ্ধি মানুষের সহজাত। সব সময় সেটা শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নাও হতে পারে। দিনের পর দিন অত্যাচারিত হতে-হতে ওর মনের মধ্যে বারুদ জমা হয়েছিল একটু-একটু করে। পান্নার উপর করা অপরাধটা সেই বারুদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।''
কিশোর বলল, ''জানো তো, মাসিমা বলছিলেন, সন্ধ্যা যা করেছে সেটা অনেকেরই করা উচিত। যদি কোনও মেয়ে ধর্ষিত হয়ে পুলিশে যায়, তার কী হবে? ডাক্তার, আদালত, সাক্ষী, বিচার, একটা লম্বা প্রসেস। আর এই পুরো সময়টা ধরে মেয়েটিই হ্যারাসড হতে থাকে দিনের পর দিন। তার বিয়ে তো হবেই না। তার বোন থাকলে, তারও হবে না। এছাড়া সোশ্যাল লেগপুলিং তো আছেই। বরং ধর্ষকের নিজের লোকেরাই তাকে শাস্তি দেওয়ার ভারটা তুলে নিলে ভাল। মা-বাবা তো শাসন করতেই পারে, স্ত্রীরও অধিকার আছে। এছাড়া নিকট বন্ধু বা প্রতিবেশীরা এগিয়ে এলেও মন্দ হয় না।''
''সে যা হোক, পান্নাকে বোঝানোর দায়িত্ব কে নেবে? কোনও মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার কি?''
''না রে কিশোর।'' রাগিণী বলল, ''মনোবিজ্ঞানীর কাছে নিয়ে গেলে কথাটা রটে যাবে। ওর বাবাই তো এখনও কিছু জানে না। তার চেয়ে আমাদের মধ্যে

থেকে যদি কেউ ওকে আগে বোঝাই?''
''ঠিক আছে, তুই আর আমি যাই চল।'' শর্বরী বলল।
''সুহাসিনী মাসিমাকে সঙ্গে নেবে?'' কিশোর জিজ্ঞাসা করল, ''মাসিমা কিন্তু আর একটা কথা বলেছেন, বলেছেন, সন্ধ্যা তোমাদের বাহিনীর সবচেয়ে দক্ষ সদস্য হতে পারে। বিদ্যার খামতি ও বুদ্ধি দিয়ে পুষিয়ে নেবে। অসাধারণ স্ট্যামিনা ওর।''
''হুঁ, তাই তো মনে হচ্ছে।'' শর্বরী মেনে নিল কথাটা। তারপর রাগিণীকে জিজ্ঞাসা করল, ''সন্ধ্যা পান্নাকে বোঝাচ্ছে না কেন? মেয়েটা ওকে খুব মানে, ভালও বাসে। সম্পর্ক শুধু রক্ত দিয়েই হয় না। প্রমাণ তো পেলাম।''
''হ্যাঁ। বোঝাচ্ছে তো। কিন্তু একা পারছে না বলেই আমাদের জানিয়েছে, এটাও হয়তো বাহিনীরই একটা কাজ মনে করছে ও।''
''সন্ধ্যা মন্মথর বর্তমান অবস্থাটা কি পান্নাকে জানিয়েছে? সেটা শুনলে হয়তো পান্না একটু আশ্বস্ত হত, খুশিও।''
''হ্যাঁ জানিয়েছে, অন্যরকম করে। বলেছে, মন্মথকে কারা যেন আধমরা করে ফেলে দিয়ে গিয়েছে বাড়িতে। জীবনে আর কোনও অপরাধ করার সাধ্য নেই তার, নারীসঙ্গ তো দূরের কথা। তবে কাজটা ও নিজে বাহিনীর সাহায্য নিয়ে করেছে সেটা বলেনি। কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি ও। নিজে এক্সপোজ়ড হয়ে গেলে আমরাও প্রকাশিত হয়ে যাব সে কথা ওর মাথায় আছে।''
''গুড, চল একদিন পান্নার বাড়ি আমরা দু'জনে যাই। পরে দরকার হলে মাসিমাকে ডাকব। আর কিশোর, তোর এখানে কোনও ভূমিকা নেই।''
''হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য একটা কথা। আমাদের কাজ কিন্তু দিন- দিন বেড়েই চলেছে। শেষ পর্যন্ত আইন নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ার অপরাধে আমরাই না ফেঁসে যাই। কারও সঙ্গে একটু আলোচনা করতে পারলে ভাল হত।''
''যার তার সঙ্গে কথা বলতে যাস না। আমরা এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও বেআইনি কিছু করিনি। মন্মথর কেসটা একটু জটিল কিন্তু কোনও সাক্ষী নেই আমাদের বিরুদ্ধে। যদি সন্ধ্যা বেইমানি করে, ও-ই মরবে আগে। আর সেটা ও করবে না।''
''যার-তার সঙ্গে না। আমার এক দাদা বেলেঘাটা থানার অ্যাডিশনাল ও.সি। খুব ভাল লোক। ওর একটা পরামর্শ নিতে পারি। তবে মন্মথর কেসটা আমি ডিসক্লোজ়ড করব না।''
''ঠিক আছে, যা করবি সাবধানে।''

পান্নাকে অনেক রকম করে বোঝাল শর্বরীরা। কিন্তু পান্না অবুঝ। সে বলল, ''তোমরা আমাকে যতই নারী জীবনের মাহাত্ম্য বোঝাও, আমি বুঝেছি একটা মেয়ে কতটা অসহায়, কতটা অরক্ষিত।''
''পুরুষ হয়ে গেলেই সুরক্ষিত হয়ে যাবে? মনটা কিন্তু তোমার মেয়েরই থাকবে।''
''কয়েকটা দিক থেকে তো হবই। আর মন? সে থাকুক না যেমন খুশি।''
''জেন্ডার চেঞ্জ অত সহজ নয়। তুমি এর কতটুকু জান? ছেলেমানুষ তুমি।''
''চিরকাল তো আর ছেলেমানুষ থাকব না। আর কিছু দিন পরেই আঠারো হবে আমার। তাছাড়া প্লাস্টিক সার্জারিতে ওটা সম্ভব। আমি জেনেছি।''
''কী জেনেছ?''
''শোনো, প্লাস্টিক সার্জারির মধ্যে দু'টো ভাগ আছে। একটা হল রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারি আর অন্যটা হল কসমেটিক সার্জারি। এই কসমেটিক সার্জারি তো এখন দারুণ পপুলার। জানো নিশ্চয়ই। শুধু ফিল্মি দুনিয়া নয়, এখন পয়সা থাকলে যে কোনও শূর্পণখা সহজেই রম্ভা হয়ে যেতে পারে। আগে কেউ দেখতে খারাপ হলে সে ভাবত, কী করব ভগবান যেমন বানিয়েছে। এখন আর তা নয়। প্লাস্টিক সার্জন ভগবানের তৈরি জিনিসের ভোল পালটে দিতে পারে এখন।''
শর্বরী পান্নাকে লক্ষ করছিল, মনে-মনে ভাবল, যে কোনও বড় আঘাত মানুষের বয়সকে হঠাৎ বাড়িয়ে দিতে পারে। মুখে বলল, ''হ্যাঁ, কসমেটিক সার্জারির বাড়-বাড়ন্তর কথা আমি শুনেছি। কিন্তু জেন্ডার চেঞ্জ তো এই পর্যায়ে পড়ে না। পড়ে কি?''
পান্না মাথা নাড়ল, ''ওটা রিকনস্ট্রাকটিভ সার্জারির মধ্যে পড়ে। আমি একজন সার্জনের সঙ্গে কথাও বলেছি। তিনি বলেছেন কাজটা ধাপে-ধাপে করতে হয়। নারী থেকে পুরুষ হতে চাইলে তিনটে ধাপ অতিক্রম করতে হবে। ছ'মাস লাগবে।''
''তিনি রাজি হয়ে গেলেন? আশ্চর্য! এমন একটা সুন্দর মেয়ে!''
''রাজি না হওয়ার কিছু নেই। এটাই তো তাঁর কাজ। কিন্তু তিনি আমার অসুবিধের কথাটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। সেদিক থেকে তাকে সৎ বলতে হবে।''
''কী-কী অসুবিধে?''
''প্রথমত, আমি মনে-মনে মেয়ে। আমার কোনও 'জি আই ডি' প্রবলেম নেই। জি আই ডি মানে হল জেন্ডার আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার, তাতে আমি ভুগছি না। অর্থাৎ অনেকে থাকে না? যারা মানসিকভাবে পুরুষ, পুরুষ জীবনটা এনজয় করতে চায়, পুরুষালি হাব-ভাব। শুধু মেয়ে হয়ে জন্মেছে। তারা যদি পুরুষের শরীর পেতে চায় তাহলে পরে তার কোনও অসুবিধে হবে না। কিন্তু আমার সেটা নয়। আমি মানসিকভাবে মেয়েই থেকে যাব, শুধু শরীরটা পুরুষের হয়ে যাবে। জোর করে একটা মেয়ের পুরুষ সাজার মতো। সেটা হয়তো আমাকে কষ্ট দিতে পারে, মানসিকভাবে। সুতরাং তিনি আমাকে বার-বার ভেবে দেখতে বলেছেন।''
''তবুও তুমি তোমার সিদ্ধান্তে অবিচল? কেন?'' রাগিণী আর শর্বরী দু'জনেই অবাক হয়ে গেল। পান্না অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে থাকল, তারপর ক্ষুব্ধ গলায় বলল, ''এই নারী শরীরটাকে আমি ঘেন্না করি। ভীষণ ঘেন্না করি। মনে হয়, শুধুমাত্র এই শরীরটার জন্যই আমি ওই লোকটার শিকার হয়েছিলাম। পরে আবার কখনও হতে পারি। সুতরাং আমি একে ত্যাগ করব, করবই।''
রাগিণীরা চুপ করে রইল।
বেশ খানিকক্ষণ পর শর্বরী বলল, ''তোমার এই অল্প বয়সে ডাক্তার রাজি হবেন?''

শর্বরী পান্নাকে লক্ষ করছিল, ভাবল, বড় আঘাত মানুষের বয়সকে হঠাৎ বাড়িয়ে দিতে পারে।

"হ্যাঁ, সেটাও বলেছেন ওই ডাক্তার। আমি সাবালিকা না হলে আমার এই ইচ্ছের দাম নেই! তাই আমি ঠিক করেছি, সাবালিকা হলে তবেই আমি লিখিত কনসেন্ট দেব ওঁকে। তাছাড়া আমি তো বাবাকে কিছু লুকোব না। বাবাকে সব বলে, তার মত নিয়ে, তবেই ডাক্তারের কাছে যাব।"
শর্বরীদের আর কিছু বলার ছিল না। ওরা উঠে পড়ল। পান্না খুব মিষ্টি করে বলল, "তোমরা কিন্তু আবার আসবে, কেমন?"
"হ্যাঁ আসব।"
রাস্তায় এসে রাগিণী বলল, "কীরকম বুঝলি?"
"এখনও আমাদের হাতে কিছুটা সময় আছে। আস্তে-আস্তে ওকে হয়তো বোঝাতে পারি যে নারী জীবনটা কত সুন্দর। দুর্জনের ভয়ে সেই সুন্দর জীবনটা নষ্ট করা একরকম হেরে যাওয়াই। দেখা যাক কী হয়।"
"পান্নার মা নেই, এটাও একটা অসুবিধের দিক। মেয়েরা মায়ের মতো হতে চায়। ওর সামনে তো কেউ নেই।"
"সেটা ঠিকই বলেছিস। দেখি, ঝটিকা বাহিনী তো হার মানে না।"
ঝটিকা বাহিনী যে সত্যিই হার মানে না তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন রাগিণী নিজেই একজন প্লাস্টিক সার্জনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করল। এই ডাক্তারের যথেষ্ট নাম আছে।
রাগিণী সরাসরি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করল। নির্দিষ্ট দিনে পৌঁছেও গেল চেম্বারে। এখানে আগেই ডাক্তারের ভিজিট রিসেপশনে জমা দিয়ে দিতে হয়। রাগিণী ছ'শো টাকা জমা দিল, তারপর ওয়েটিং রুমে গিয়ে বসল।
বসে-বসে নানারকম পত্রিকা পড়ছিল রাগিণী। প্লাস্টিক সার্জারির কয়েকটি পুস্তিকা ছিল, সেগুলোও দেখছিল। সত্যি, ডাক্তারি শাস্ত্র কোথায় যে পৌঁছে গেছে! দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়।
প্রায় ঘণ্টা দেড়েক অপেক্ষা করার পর রাগিণী ভিতরে ডাক পেল। ডাক্তারবাবু তাকে অনেকটাই সময় দিলেন।
পুরো প্রসেসটা তাকে এঁকে নিয়ে বুঝিয়ে দিলেন সুন্দরভাবে।
ডাক্তারের ধৈর্য ও অমায়িক ব্যবহার রাগিণীকে মুগ্ধ করে দিল।
ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর রাগিণী শর্বরীকে ফোনে ব্যাপারটা বলল। শর্বরী বলল, "তোর কী মনে হয়, পান্না ফেঞ্জগুলো পার হতে পারবে?"
"ডাক্তারবাবু বলেছেন, প্রথম ধাপে দু'জন সাইকিয়াট্রিস্টের সার্টিফিকেট লাগবে আর কোর্টের থেকে নাম এফিডেভিট করে নিয়ে আসতে হবে। তারপরই তিনি ব্যাপারটা নিয়ে এগোবেন। আমার মনে হচ্ছে পান্না যে ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছে সে সিরিয়াসলি নেয়নি ব্যাপারটা। সাবালিকা হওয়ার পর দেখা যাবে বলে ছেড়ে দিয়েছেন।"
"কেন? এরকম মনে হচ্ছে কেন তোর?"
"কারণ, আমার বিশ্বাস দু'জন মনোবিজ্ঞানীর সার্টিফিকেট পান্না পাবে না, বেশি কথা কী, আমি ওকে যেদিন কাউন্সেলিং করব, পুরো ছবিটা ওর কাছে তুলে ধরব, সেদিনই ও পিছিয়ে যাবে!"
"তোর এতটাই আত্মবিশ্বাস আছে রাগিণী?"
"আছে। আমি যেদিন পান্নার সঙ্গে কথা বলব, তুই-ও থাকতে পারিস সেদিন সঙ্গে।"
"না, কাউন্সেলিং করার সময় দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি ঠিক নয়। পরে তোর থেকে শুনে নেব।"

পান্না আর রাগিণী মুখোমুখি বসে আছে। রাগিণী প্রথমে কথা বলল, "তোমার সিদ্ধান্ত বদলেছে, না অবিচল?"
"আমার মন পালটায়নি। আমি যা ঠিক করেছি তাই-ই করব।"
"তুমি কি জানো, ডাক্তারবাবু প্রথমেই তোমাকে দু'জন মনোবিদের কাছে পাঠাবেন, তারা তোমার কাউন্সেলিং করে রিপোর্ট দেবে। তুমি ওদের পজেটিভ সার্টিফিকেট পাবে? তোমার মনের সে জোর আছে?"
"হ্যাঁ, আছে।"
"কোর্ট থেকে নিজের নাম বদলে একটি ছেলের নাম নিতে হবে। পারবে?"
একটু সময় রাগিণীর দিকে তাকিয়ে থাকল পান্না, কিছু ভাবল, তারপর বলল, "পারব।"
"দ্বিতীয় ধাপে তোমার হরমোন থেরাপি শুরু হবে। তারপর ল্যাপ্রোস্কোপি করে তোমার শরীরের নারীঅঙ্গগুলি মানে সব ফিমেল অর্গ্যান, যেমন ওভারি, ইউটেরাস, ফ্যালিপিয়ন টিউব, এমনকী ভ্যাজাইনা পর্যন্ত বের করে ফেলে দেওয়া হবে।"
পান্না সোজা তাকিয়ে আছে রাগিণীর দিকে।
রাগিণীও পান্নার চোখ থেকে নিজের চোখ সরাল না। একেবারে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করল, "তোমার ওই সুন্দর স্তন দুটি অপারেট করে বাদ দিয়ে দেবে, সহ্য করতে পারবে তো?"
আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল পান্না। ওর চোখে যেন জল দেখতে পেল রাগিণী, বলল, "এর পরে আরও কতগুলো ধাপ আছে।"
পান্না উঠে অন্য ঘরের দিকে ছুটে চলে গেল।
কিছুক্ষণ একাই বসে রইল রাগিণী। তারপর উঠে পড়ল। ধীরে সুস্থে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। মনে-মনে ভাবল, বাইরের মনোবিদ লাগবে না। রাগিণীর কাউন্সেলিংয়েই বোধহয় মেয়েটার মাথা থেকে একটা আজগুবি ভূত তাড়ানো যাবে।

১৬

কিশোর ঠিক জানে না শুভনীলের থানায় কীরকম ডিউটি চলছে এখন। সকালে না সন্ধেয়, ও সাত পাঁচ ভেবে অফিসে যাওয়ার আগেই শুভনীলের বাড়ি চলে গেল। ভাবল, যদি বাড়িতে না পায় তাহলে কখন পাবে জেনে নেবে। অ্যাটলিস্ট শুভদার ফোন নম্বরটা বাড়ি থেকে নিয়ে নেবে।
"শুভদা।" একটা জোর হাঁক দিয়ে কলিংবেল টিপল ও। শুভনীল কিশোরের কোনও সম্পর্কিত দাদা নয়, মানে জেঠতুতো-মাসতুতো-এমনকী পাড়াতুতো দাদাও নয়। গুরুতুতো বলা যেতে পারে। একটা সময় শুভনীল কিশোরের আইডল ছিল। শুভদার মতো স্বাস্থ্য করতে হবে, শুভদার মতো খেলোয়াড় হতে হবে, শুভদার মতো পরোপকারী হতে হবে, এইরকম আর কী! মনে-মনে কিশোর শুভনীলকে গুরু মানত, মুখে দাদা বলত, কিন্তু মনে-মনে ওয়ারশিপ করত।
কেউ দরজা খুলল না তো, অবাক হয়ে আবার কিশোর ডাকল— "শুভদা।"
এবার একটি সুদর্শন মধ্যবয়সি মানুষ এসে দরজা খুলল। পাজামার ওপর ফতুয়া, নাইটড্রেস পরে এখনও শুভদা? কী ব্যাপার?
"তুমি এবেলা থানায় যাবে না? তোমার কি ওবেলায় ডিউটি?"
"কোনও বেলাতেই ডিউটি নেই। যাক সে কথা। তোর কী খবর? হঠাৎ আমার কাছে এলি? কী মনে করে রে? সান্ত্বনা দিতে নয়তো?"
"সান্ত্বনা? তোমাকে? কেন? আমি এসেছি একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোমার সঙ্গে ডিসকাস করতে। একটা প্রোটেকশনের ব্যাপারে কথা বলতে।"
"প্রোটেকশন?" হো-হো করে হেসে ফেলল শুভনীল দাশগুপ্ত।
"হাসছ কেন? ভয় নেই, আমি চুরি-ডাকাতি করে তোমার সাহায্য চাইছি না।"
"আমাকে কে এখন প্রোটেকশন দেয়,

তার ঠিক নেই। আমি তোকে জ্ঞান দেব?"
"মানে? তোমার আবার কী হল? তোমার কি থানায় যাওয়ার তাড়া আছে? তাহলে বলো, আমি পরে আসব।"
"বোস-বোস। আমার কোনও যাওয়ার তাড়া নেই। আমি এখন একজন সাসপেন্ডেড পুলিশ অফিসার।"
"তুমি সাসপেন্ড হয়েছো? কী বলছো শুভদা?"
"হুঁ, বলছি সব। এসে যখন পড়েছিস, সবটাই শুনে যা। চা খাবি তো? বোস, চায়ের কথা বলে আসি।"
শুভনীল ভিতরে চলে গেল। হতভম্ব হয়ে বসে রইল কিশোর। তাই শুভদাকে ওরকম উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছিল!
চা-খেতে-খেতে শুভদার জীবনের আশ্চর্য কাহিনি শুনল কিশোর।
একদিন থানায় ফিরছিল শুভনীল জিপ নিয়ে। হঠাৎ ফুলবাগানটা পার হয়ে বাজার এলাকায় একটা হল্লা শুনতে পেল। জিপ থামিয়ে শুভনীল এগিয়ে গেল। দেখল, একটা মস্তান গোছের বখাটে ছেলে একজন বুড়ো লোকের ঘাড় ধরে ঝাঁকাচ্ছে আর বলছে, "বল দিবি কি দিবি না?"
"না, আমি দেব না। কেন দেব?"
"তোর এত সাহস? ভোম্বলের মুখের উপর না বলছিস?"
শুভনীল দু'একজনের সঙ্গে কথা বলে বুঝে নিল, ভোম্বল হল এ পাড়ার উঠতি মস্তান। বাজারের দোকানদারদের থেকে তোলা নিতে শুরু করেছে। সবাই ভয়ে-ভয়ে দিয়ে দিয়েছে, কিন্তু এই বৃদ্ধ কিছুতেই তোলা দেবে না। তাই এই শাসন-তর্জন। শুভনীল গিয়ে ভোম্বলের কাঁধে হাত রাখল।
সাঁ করে ভোম্বল ঘুরে গেল, "কে রে?"
"আমি ভাই, ওকে ছেড়ে দাও। সব ব্যাপারে জোর করতে নেই।"
"ওরে, নতুন থোবড়া মনে হচ্ছে। যান-যান, এসব আমাদের নিজেদের ব্যাপার। বেশি ওস্তাদি করতে হবে না।"
ভোম্বলের কথার ধরন খুবই খারাপ ছিল। শুভনীল ওর গালে একটা চড় মারল, "থোবড়া পরে চিনলেও চলবে। এখন ওকে ছেড়ে দাও।"
"এই মাটিতে লাশ ফেলে দেব, তোর বাবাও বাঁচাতে আসবে না।"
শুভনীল অনেকক্ষণ ধৈর্য ধরেছে। এবার আর পারল না। বেধড়ক মার দিল ভোম্বলকে। ওর ঠোঁট কেটে গেল, কপাল ফুলে গেল। কলার ধরে টানতে-টানতে জিপে তুলে থানায় নিয়ে এল। তারপর সোজা লক-আপে। শুভনীল ওর চেয়ারে বসে পড়ল। নিজেও হাঁফিয়ে গিয়েছে। এর মধ্যেই থানার ওসি ঘরে ঢুকল। সঙ্গে-সঙ্গে ভোম্বল চেঁচিয়ে ডাকল, "সুদীপদা-সুদীপদা।"
"আরে ভোম্বল, তুমি ওখানে কেন?"
"আমাকে আগে বের করুন, সব বলছি।"
ভোম্বল লক-আপ থেকে বেরিয়েই অন্য মূর্তি ধরল।
উলটে সে শুভনীলের নামেই এফ আই আর করাতে চায় কারণ সে নিজের চোখে দেখেছে, এই অফিসার বাজার থেকে তোলা তুলছিল। ভোম্বল সৎ নাগরিক হিসেবে বাধাও দিয়েছিল। তাই লোকটা তাকে ধরে নিয়ে এসে উলটো কেস দিতে চাইছে। আর লক-আপে প্রচুর মেরেছে।
ওসি শুভনীলের দিকে তাকাল, "এই সব আপনি কী শুরু করেছেন? আপনি তো এখানে এসেছেন বেশি দিন হয়ওনি। ভোম্বল তো ভাল ছেলে।"
"স্যর, আপনি এই গুন্ডাটার কথা বিশ্বাস করছেন, আমার কথা বিশ্বাস করছেন না? ও বাজারে তোলা তুলছিল, নিরীহ দোকানদারদের মারধর করছিল। আমার সঙ্গেও ও হাতাহাতি করেছে।"
"আপনার কোনও সাক্ষী আছে?"
"ওর সাক্ষী আছে? বাজারে প্রকাশ্যে তোলা তুলছিলাম আমি বলছে যে?"
"আমার সাক্ষী আছে স্যর।" ভোম্বলের কথা শেষ হতে না হতেই দু'টো ছেলে ঢুকে পড়ল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ স্যার, ভোম্বলের কথাই সত্যি। ওকে এখানে কে না চেনে? আমরা ওই বাজারেই ছিলাম। এই অফিসার বাজারে তোলা তুলছিল। ভোম্বল আপত্তি করতেই, ওকে হিড়হিড় করে ধরে নিয়ে এল।"
শুভনীল বুঝল, এরা ভোম্বলের দলের। জিপের পিছন-পিছন এসেছে। ও বলল, "বাজারে গিয়ে আমি এক্ষুনি আমার সাক্ষী আনতে পারি স্যর। আপনি আমাকে দশ মিনিট সময় দিন।"
"সে নিশ্চয়ই দিতে পারি। কিন্তু তার আগেই আমাকে এই ভদ্রলোকের অভিযোগ নিতে হবে। আপনি ওকে লক-আপে এনে মারলেন কেন? নিয়মবিরুদ্ধ কাজ!" ওসি'র কথায় ভোম্বল আরও জোর পেল, "দেখুন স্যর, কীভাবে মেরেছে। কপাল ফুলে গেছে, কালশিটেও পড়ে গেছে নিশ্চয়ই। ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্ত পড়ছে, দেখুন।"
"মিথ্যে কথা বলছে। লক-আপে আমি ওর গায়ে হাতই দিইনি।"
শুভনীলের দিকে তাকিয়ে ওসি বললেন, "চোখে তো দেখতেই পাচ্ছি। কাজটা ভাল করলেন না। এর জন্য আপনাকে মূল্য দিতে হবে।"
শুভনীল অবাক হয়ে গেল। ভোম্বল সাধুপুরুষের মতো মুখ করে তাকিয়ে আছে। আর ভদ্রলোকের সামনে বসে কেস লেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে অমায়িক ও ন্যায়পরায়ণ অফিসার ইনচার্জ সুদীপ বটব্যাল।
এতক্ষণ পর কিশোর কথা বলল, "তারপর কী হল?"
"তারপর আর কী? আমি বাজারে গিয়ে দোকানদারদের সঙ্গে কথা বললাম। ওরা কেউ সাক্ষী দিতে রাজি হল না। সবাই বলল, ভোম্বলের সঙ্গে থানার ওসি'র রফা করা আছে। আমি কিছু করতে পারব না। ভোম্বলের হয়ে অনেক সাক্ষী জুটে যাবে। ওসি নিজেই ওকে ব্যাক করবে। আমি এই থানায় নতুন তাই কিছু জানি না।"
"সেই বৃদ্ধ, তাঁর দোকান?"
"সেই দোকানটা বন্ধ দেখলাম। পাশাপাশি দোকানিরা বলল, এই দোকান আর খুলবে না স্যর। ও শেষ।"
"তুমি কিছু করতে পারলে না?"
"কী করব? উলটে আমার বিরুদ্ধে দারুণ অভিযোগ। সাসপেন্ডেড হয়ে গেলাম পনেরো দিনের জন্য। এর মধ্যে যদি সাক্ষী জোগাড় করতে পারি কিংবা ভোম্বলকে দিয়ে স্বীকার করাতে পারি সব কিছু, তাহলে ভাল। আমার সম্মান থাকবে। না হলে অন্য থানায় বদলি তো হতেই হবে, কেসও চলবে আমার বিরুদ্ধে।"
"তুমি একবার ভোম্বলের বাড়ি যেতে পারতে শুভদা।"
"গিয়েছিলাম। ওর বাবা খুব ভাল লোক। স্কুল টিচার ছিলেন, রিটায়ারড। খুব দুঃখ করলেন। ছেলেকে মানুষ করতে পারেননি বলে নিজেকেই দুষলেন। তবে ওই ছেলের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক রাখেননি। ভোম্বলকে বাড়িতে ঢুকতে দেন না। ছোট ছেলেকে নিয়ে থাকেন।"
"আর কিছু বললেন? ভোম্বলের সম্বন্ধে?"
"না সেরকম কিছু নয়। ছেলের কুকীর্তির কথা বলতে কোন বাবার আর ভাল লাগে? ভোম্বল বাবাকে মানে না, শোনেও না তাঁর কথা। শুধু বাপ কেন, কারও কথা সে শোনে না, কাউকে কেয়ার করে না। শুধু ছোটভাই বাদলকে খুব ভালবাসে। ওই একটাই মাত্র দুর্বলতা ওর।"
কিশোর সব শুনে চুপ করে রইল। শুভদা নিজেই কাদায় পড়ে। যা বলতে এসেছিল তা বলে আর কী লাভ হবে?
শুভনীল বলল, "আমার কথা তো তুই সব শুনলি। এবার বল তুই কেন এসেছিলি?"
কিশোর একটু-একটু করে প্রায় সবটাই বলল। কেন শুভদার কাছে এসেছে সেটাও বলল। সব শুনে শুভনীল হাসল, "একেবারে চমকে দিচ্ছিস যে কিশোর!

ঝটিকা বাহিনী? ভাল। সাবধানে চলিস। সব ব্যাপারে ছেলেখেলা করিস না। মন্মথর কেসটায় ফেঁসে যেতে পারিস। সন্ধ্যা ক্যাচাল করলে ডুবে যাবি।''

''তাতে সন্ধ্যাও তো ডুববে।''

''হুঁ, মেয়েদের তুই চিনিস না। 'স্বামী' ওদের কাছে বহুত বড়িয়া জিনিস। কখন ধম্মবোধ জেগে উঠবে কে জানে! মরি তাও ভাল, স্বামীর পায়ে মাথা রেখে যাই। ওরা এই সব হৃদয় দৌর্বল্যে ভোগে। আইন বাঁচিয়ে চলবি। দরকার হলে উকিলের সঙ্গে কথা বলবি। তবে বাঁকা পথের লোকদের সোজা পথে আনা অত সহজ নয়।''

''তোমার কেসটা আমরা দেখব শুভদা?''

''আমার কেস? তোদের ওই ঝড় তোলা দল দেখবে?''

''অত আন্ডারএস্টিমেট কোরো না। আমরা ভাল-ভাল কাজ করি।''

শুভনীল হেসে ফেলল। তবে ওর হাসিকে গুরুত্ব না দিয়ে ভোম্বল তোলাবাজের সব খবর লিখে নিল কিশোর। বাড়ির ঠিকানা, ভাইয়ের নাম, স্কুল, সব। শুভদা একদিন কিশোরের গুরু ছিল। যদি গুরুদক্ষিণা দিতে পারে, মন্দ হবে না।

শুভদার মোবাইল নম্বর, থানার ঠিকানা, ফোন নম্বর, সব নিয়ে নিল। ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রাগিণীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

১৭

রাগিণীর বাবা হিমাদ্রিবাবু আর দেরি করতে চান না। অংশুমান যখন এখানে পোস্টেড হয়ে গেছে, তখন আর অসুবিধা কী? তাই রাগিণী-অংশুর বিয়েটা তিনি এবার দিয়ে দিতে চান। অংশুমানের মা কমললতার সঙ্গে কথাও হয়েছে টেলিফোনে। কমললতারও সেই মত।

রাগিণী এত দিন মনে-মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল। কিন্তু বিয়েটা যখন একেবারে সামনে চলে এল, তখন একটু চমকে উঠল। তাহলে এসে গেল সেই দিন? বিশেষ করে এখন ওদের যে একটা দল তৈরি হয়েছে, এটা ওদের কাছে ভীষণ ইমপর্ট্যান্ট। বাড়ি, অফিস, এসবের বাইরে একটা অন্য জীবন।

এর কথা অন্য কাউকে বলা যাবে না। এমনকী অংশুকেও না। বিয়ের পর কি রাগিণী আর এই বাহিনীর কাজ চালাতে পারবে? মনে-মনে সন্দিহান হয়ে পড়ছে ও। শর্বরীকে এই কথা বলায় ও বলল, ''কেন পারবি না? আমি তো বিবাহিত জীবন সামলেই চালাচ্ছি। এর তো কোনও খোঁজই কেউ জানবে না। আর এটায় তো কোনও বাধ্যবাধকতা কিছু নেই। আমরা বুঝে শুনে কেস নেব। তেমন হলে এক-এক জায়গায় কেউ গ্যাপ হয়ে যেতে পারে।''

''এই কাজে আমার খুব একটা প্যাশন চলে এসেছে। অফিসের কাজের থেকেও বেশি গুরুত্ব দিতে শুরু করেছি বোধহয়।''

''আমারও তাই। স্কুলের ব্যাপারটা তো হাতের মুঠোয়। ওটা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার দরকারই নেই। কিন্তু এটা খুব ইমপর্ট্যান্ট আমার কাছে। হয়তো সার্থকতাই আমাদের আরও বেশি আগ্রহী করে তুলেছে। একটু-একটু করে দলটা ভারীও হয়ে যাচ্ছে, তাই না?''

''হ্যাঁ। পান্নাকেও তো আমরা অনেকটা বোঝাতে সক্ষম হয়েছি। ছেলে হয়ে যাওয়ার এই আজব ইচ্ছেটা ওর ঘাড় থেকে নামাতে পারব বোধহয়। তুই ঠিকই বলেছিস, সাকসেস আমাদের এনকারেজ করছে।''

''তবে? তুই বিয়ে করতে হবে বলে ঘাবড়াস না। গো-অ্যাহেড। সংসার চলবে, চাকরি চলবে আবার ঝটিকা সফরও চলবে।''

কিশোর ফোন করল রাগিণীকে। কিন্তু ফোনে কিছু বলল না। দেখা করতে চাইল, বলল, ''জরুরি দরকার আছে।''

রাগিণী বলল, ''একাই আসব, নাকি শর্বরীকে ডেকে নেব?''

''ডেকে নিলেই ভাল হয়। তাহলে আর দু'বার আলোচনায় বসতে হবে না।''

''বেশ, যদিও আমরা নিজেদের বাড়িটা মিটিং প্লেস করি না, তবু বলছি তোরা দু'জনেই আমার বাড়িতে আয় আজ সন্ধের পর।''

''ঠিক আছে, তুমি শর্বরীদিকে ডেকে নাও তাহলে।''

শর্বরী সোজা স্কুল থেকে আসেনি। বাড়ি হয়ে এসেছে। তাহলে একটু বেশি সময় থাকতে পারবে। কিশোরও তাই, মানে ওর আজ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত ডিউটি ছিল। ডিউটি শেষ করে বাড়ি গিয়ে ফ্রেশ হয়ে এসেছে। আজ তার মনে আলো জ্বলছে। মধুরিমা নিজে থেকেই কথা বলেছে আজ। যাই হোক মধুরিমা এপিসোডটা রাগিণী কিংবা শর্বরী জানে না। ওরা কিশোরকে চার্জড দেখে খুশিই হল।

কিশোরের মুখ থেকে শুভনীলের সব কথা শুনে রাগিণী বলল, ''কেসটা আমাদের নিতেই হবে। কারণ শুভনীল দাশ আমাদের তাচ্ছিল্য করেছে, এটা আমার সহ্য হচ্ছে না। উপরন্তু পুলিশকে একটু ইমপ্রেসড করে রাখা ভাল। অসময়ে কাজে আসবে।''

''পুলিশে কোথায় আমাদের সাহায্য করবে তা নয়, আমরাই পুলিশকে সাহায্য করছি। ঠিক আছে। কাজটা দু'ভাগে ভাগ করে নাও। এক ভাগ নজরদারি করবে সুদীপ বটব্যালের উপর, অন্য ভাগ ভোম্বলের উপর। ঠিক আছে?''

''ওই ওসি'কে নিয়ে তুমি কী ভাবছ শর্বরীদি? সে ভেজাল লোক, শুভদার শত্রুই মনে করো ওকে।''

''ভেজাল সরাতে হবে। শুভনীলকে ভোম্বলের কবল থেকে বের করতে হলে আগে ওই ওসি'র বদলি চাই।''

''কথাটা ঠিক কিন্তু কাজটা সহজ নয়।

পুলিশের উপর মহলে তদবির করতে হবে। আমার সেরকম কেউ নেই। তোমাদের আছে?'' কিশোর শর্বরী আর রাগিণীর দিকে তাকাল। রাগিণী বলল, ''প্রমোশনের জন্য তদবির করতে হয়। এখানে একটা উপযুক্ত কমপ্লেন করলেই হবে বলে মনে হয়। কী বলিস?''

''তোর কোনও বড় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে কোনও ভাবে কানেকশন নেই?''

''মনে হচ্ছে অংশুর সঙ্গে একজন এসি'র চেনাজানা আছে। আমাকে বোধহয় একবার আলাপ করিয়েও দিয়েছিল। চেষ্টা করব?''

''করবি কিন্তু খুব সাবধানে। অংশুমানকে কিছু বলা চলবে না। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড। বুঝতেই তো পারছিস।''

''আরে না-না, মাইন্ড করব কেন? আমাদের ব্যাপারটা কতটা গোপন আমি কি জানি না? তবে একটা কথা ভাবছি, পুলিশি ব্যাপারে জড়াতে দু'বার ভাবতে হয়। ঠিক আছে দেখছি কী করা যায়।''

এসি'র ফোন নম্বর জোগাড় করেছে। একদিন ফোনে কথা বলেছে, পরিচয় না দিয়েই। কাকে কমপ্লেন করলে কাজ হবে সেটাও মোটামুটি জেনে নিয়েছে।

তারপর ওরা একটা নামহীন চিঠি লিখল। সুদীপ বটব্যাল যে অসৎ, ভোম্বলের থেকে বাজার তোলার ভাগ নেয় সেটা ডিটেল লিখল। একদিন এন জি ও'র লোক সেজে বাজারে গিয়ে অনেক দোকান আর দোকানদারের নাম লিখে নিয়ে এসেছে কিশোর নিজে। ওদের বলেছে বাজারটা উন্নতি করার চেষ্টা চলছে, ভোম্বলের নামও তোলেনি। ফলে দোকানিরা তাড়াতাড়ি করে নিজেদের নাম, দোকানের নাম দিয়েছে। সেই লিস্ট থেকে কয়েকজনের নাম দিয়ে দিল ওই চিঠিতে। পুলিশ ইচ্ছে হলে ওদের আলাদা জিজ্ঞাসা করে নিতে পারে। তার সঙ্গে এও লিখে দিল, ভোম্বলকে বাঁচাতে সুদীপ তার সাবোর্ডিনেট কোলিগকে কীরকম হ্যারাস করেছে। সুদীপের সাজানো কেস ওর

শুভনীল ফোন নামিয়ে রাখল।

এদিকে তো আসল কাজই বাকি। ভোম্বল, বাদল, তার বাবা, সকলের খবর এখন শর্বরীদের ঝুলিতে। সুদীপ অপসারণের সঙ্গে-সঙ্গে এদিকের কাজও তো থেমে নেই।

সমস্ত প্ল্যান রেডি। ভোম্বলের দু'টো শাগরেদ আছে। একটার নাম মনা অন্যটার নাম বিট্টু। ওদেরও নজরে রেখেছে বাহিনী। ভোম্বল অবশ্য ভাবতেও পারেনি, ওর বিপদটা কোন দিক থেকে আসবে। ভোম্বলের সেল ফোন নম্বরটা দরকার ছিল। সেই কাজটা সুহাসিনী করে দিলেন। ভোম্বলের পাড়ায় বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দাঁড়ালেন একদিন, যে সময়টায় ভোম্বল আসে ওখানে। দূর থেকে দেখে বাদলকে, বাদল যখন বাসে ওঠে স্কুলে যাওয়ার জন্য। ও বাদলকে না দেখে থাকতে পারে না। বাবা তো ওকে বাড়িতে ঢুকতে দেয় না। দাদার সঙ্গে কথা বলতেও বারণ করে দিয়েছে বাদলকে। অগত্যা এই-ই উপায় ভোম্বলের।

সুহাসিনী কাঁদো-কাঁদো মুখে ভোম্বলকে বলল, ''বাবা, তোমার ফোন থেকে আমাকে একটা ফোন করতে দেবে? ছেলেকে একটা ফোন করব, জরুরি ফোন।''

ভোম্বল ওর ফোনটা সুহাসিনীকে দিল। ভোম্বলের তখন নজর ছিল বাদলের দিকে। অত কিছু ভাবল না। বুড়িটাকে বিনাইন মনে করল।

সুহাসিনী প্রথমেই শর্বরীকে ফোন করল। তারপর কেটে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ফোন নম্বরটা ডিলিট করে দিল। তারপর একটা নয় সংখ্যার ফোন নম্বর টিপে চেষ্টা করতে লাগল। বলা বাহুল্য কানেকশান হল না। এইরকমই ওদের প্ল্যান ছিল।

ভোম্বল বিরক্ত হয়ে সুহাসিনীর দিকে ফিরল, ''কী হল, আপনার ফোন হয়েছে?''

''লাগছে না বাবা।''

''দেখি, এ কী? পুরো নম্বরটা লিখতে হবে তো।''

''আর তো মনে নেই।''

''তাহলে যান। আমার কিছু করার নেই।''

সুহাসিনী চলে গেলেন। ভোম্বলও।

বাদল স্কুলে যাবে বলে বেরিয়েছে। একটা গাড়িতে শর্বরী আর রাগিণী। গাড়িটা ওরা ভাড়া করেছে। বাদলের বাসের পিছনে-পিছনে এসে যেই বাদল ওর স্কুলের স্টপেজে নেমে হাঁটতে শুরু করল, আর সঙ্গে-সঙ্গে শর্বরীরা গাড়িটা ওর পাশে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাল।

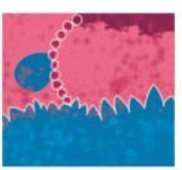

রাগিণী মনে-মনে প্রস্তুত হয়েই ছিল। কিন্তু বিয়েটা যখন একেবারে সামনে, তখন একটু চমকে উঠল।

কিশোর বলল, ''আর অন্য ভাগ কী করবে?''

''সেই ভাগটা ভোম্বলের এবং ভোম্বলের ভাইয়ের উপর নজর রাখবে। কী করে, কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কী করে ওসি'কে টাকা পাঠায়, ভাই কোন স্কুলে পড়ে, সব কিছু।''

''আর এই সবই কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হবে। আমদের সময় কম।'' কিশোর মনে করিয়ে দিল।

ওরা ঝড়ের বেগে কাজ শুরু করল। সুদীপ বটব্যাল খুব চালাক। থানার ধারে পাশে ভোম্বলের সঙ্গে কথা বলে না। জোড়া পুকুরের পাশে ভোম্বলের একটা ঠেক আছে। সেখানে গিয়ে ভাগের টাকা নিয়ে আসে। ওখানেই যা কথাবার্তা বলে ভোম্বলের সঙ্গে।

রাগিণীটা সত্যি খুব স্মার্ট। ও ভোম্বলের সঙ্গে সুদীপের কয়েকটা ঘনিষ্ঠ ছবিও তুলে ফেলেছে। অংশুমানের কাছ থেকে সেই বিরুদ্ধেই ব্যবহার করল। সুদীপ-ভোম্বলের ছবিও কয়েকটা দিল চিঠির সঙ্গে। চিঠিটা পাঠাল বেশ কয়েক জায়গায়, যেখানে-যেখানে পাঠালে কাজ হবে।

সুদীপ বটব্যাল বেলেঘাটা থানা থেকে বদলি হয়ে গেল।

সেই রাতে কিশোর শুভনীলকে ফোনে খবরটা জানাতেই চমকে উঠল শুভনীল।

''কী বলছিস তুই?''

''হ্যাঁ। তখনই বলেছিলাম, আমাদের আন্ডারএস্টিমেট কোরো না।''

''এই কিশোর, তোদের গ্রুপের সঙ্গে আমি আলাপ করতে চাই।''

''না, সেটা হবে না। এরা আড়ালে থাকতেই ভালবাসে। তবে শুভদা নতুন ওসি'র সঙ্গে একদিন কথা বলে এসো। আমাদের প্রসঙ্গ ঘুণাক্ষরেও তুলবে না, প্লিজ।''

''ঠিক আছে—ঠিক আছে।''

"শোন ভাই, তোমাকে বলছি।"
বাদলকে ওরা গাড়িতে তুলে কথা বলল, "আমরা একটা নতুন টিভি সিরিয়াল বানাচ্ছি। তোমার বয়সি আমাদের নায়ক। কয়েক দিন ধরেই ফ্রেশ মুখ খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমাকে দেখে খুব পছন্দ হল। তোমাকে দেখতেও সুন্দর আবার ইনোসেন্টও বটে। তুমি করবে?"
"আমার স্কুল আছে। আমি নাইনে পড়ি। বাবা রাজি হবেন না।"
"বেশি সময় নষ্ট হবে না। মাঝে-মাঝে গেলেই চলবে। গাড়িতে নিয়ে যাব, টাকাও দেব।" বাদল একটু চুপ করে রইল, ও ভাবছে। রাগিণীকে থামিয়ে শর্বরী বলল, "বেশ তো এখন বাবাকে কিছু বোলো না। আগে স্ক্রিন-টেস্টটা হয়ে যাক। সিলেকটেড হলে তখন দেখা যাবে। আমরাও যাব তখন।"
এবার বাদল ঘাড় নাড়ল, "বেশ। কবে স্ক্রিন-টেস্ট?"
"আজই, বিকেলে। তোমাকে স্কুল ছুটির পর নিয়ে যাব?"
"দেরি হলে বাবা চিন্তা করবেন।"
"দেরি হবে না। কাছেই একটা হোটেলে উঠেছি আমরা। তোমাকে আবার এগিয়ে দেব? কতক্ষণই বা লাগবে। তোমাকেই আগে ছেড়ে দেব, কেমন?"
বাদল রাজি হয়ে গেল।

বাদলকে একটা ঘরের সামনে বসানো হল।
ওর সঙ্গে আরও দু'জন বসে আছে, স্ক্রিন টেস্টের জন্য। ওরা হল পটকা আর কিশোর। এটা রাগিণীর বুদ্ধি। একা থাকলে বাদল সন্দেহ করতে পারে। সন্ধ্যা ভাল পোশাক পরে অ্যাটেন্ডেন্টের কাজ করছে। ওদের জল আর স্ন্যাক্স দিল।
রাগিণী একবার বেরিয়ে এসে সন্ধ্যার হাতে লম্বা একটা কাগজ দিল। বাদলকে দেখিয়ে বলল, "আমরা ডাকতে শুরু করলে প্রথমে একে ছাড়বে। দেখো, এক নম্বরে এর নাম আছে।"
"আচ্ছা ম্যাডাম।"
একটু পরে ভিতর থেকে বেল বাজল। সঙ্গে-সঙ্গে সন্ধ্যা ডাকল— "বাদল দত্ত।" বাদল উঠে দাঁড়াল। সন্ধ্যা ওকে ভিতরে পৌঁছে দিল।
বাদল ঘরের ভিতর এসে ওর জন্য রাখা চেয়ারটায় বসল।
চেয়ারের ওপাশে টেবিল। টেবিলে টেপ-রেকর্ডার। কিছু ফাইল। আরও অনেক কাগজ। দু'টো ক্যামেরাও আছে। টেবিলের ওধারে শর্বরী আর সুহাসিনী বসে আছে। রাগিণী অনেকগুলো পোজে বাদলের ছবি তুলল। বাদল একবার বলেছিল যে ওর তো কোনও মেক-আপ নেই। ছবি কি ভাল উঠবে? রাগিণী বোঝাল, ওরা মেক-আপ চায় না। এই চেহারাতেই ছবি চাই। এটাই পারফেক্ট। শর্বরী বলল, "এবার তোমাকে কিছুটা সংলাপ বলতে হবে এই স্ক্রিপ্টটা থেকে। তোমাকে দৃশ্যটা বুঝিয়ে দিচ্ছি। মন দিয়ে শোনো। তুমিই কিন্তু প্রধান চরিত্র, মনে রেখো। এটা একটা থ্রিলার। গলায় যেন ভয় আর উদ্বেগ থাকে।"
"ঠিক আছে। এবার বলি, বলতে শুরু করি?"
"ইয়েস, টেপ অন..."
"দাদা, দাদা, তুমি আমাকে বাঁচাও। এরা আমাকে এখানে আটকে রেখেছে। বোধহয় মেরেই ফেলবে।"
বাদলকে দিয়ে দু'বার বলানো হল। বলা হল, আর একটু ইমোশন দিয়ে বলো। এবার নেক্সট লাইন।
"তুমি এখনই থানায় গিয়ে ওরা যা বলে তাই মুচলেকা দিয়ে এসো। যদি সত্যিই আমাকে বাঁচাতে চাও। যাও দাদা, কারও সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা কোরো না।"
শর্বরী উল্লসিত হল, "দারুণ হয়েছে। পারফেক্ট। এবার শেষ লাইন। গলায় যেন কান্না-কান্না ভাব থাকে। ওকে? ক্যারি অন...।"
"আমি শেষ দাদা, শেষ। আর দেখা হল না।" এই পর্যন্ত বলার পর শর্বরী একটা আওয়াজ করল, বাদলও শেখানো মতো একটা কান্নাভরা চিৎকার করল।
শর্বরী উঠে এসে বাদলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করল, "খুব ভাল করেছ বাদল। থ্যাঙ্কস।"
"ভাল হয়েছে?" লজ্জামিশ্রিত সুরে বাদল বলল, "কবে রেজাল্ট জানতে পারব?"
"কালই। আজ যেমন নিয়ে এসেছে এখানে, সেরকম কালও নিয়ে আসা হবে তোমাকে। কালই জানতে পারবে।"
ওকে দু'শো টাকা দিল শর্বরী, "তোমার আজকের পারিশ্রমিক।"
"শুধু এটুকুর জন্য?"
"তাতে কী হয়েছে? এইটুকুই বা কম কি? আমরা দিয়ে থাকি। তোমাকে কি গাড়ি করে বাড়ি অবধি দিয়ে আসবে?"
"বাড়ি অবধি যেতে হবে না, একটু এগিয়ে দিলেই হবে।"
"তাহলে বাড়িতে এখন কিছু বলতে হবে না। কাল বোলো, দরকার হলে আমি যাব।"

পটকা একটা ধুলোমাখা ছেঁড়া শার্ট পরেছে। চুল উস্কোখুস্কো, খালি পা। কিশোর দূর থেকে ভোম্বলকে দেখিয়ে দিল, "ওকে এই সিডি'টা দিয়ে আসবি দৌড়ে। বলবি, তোমার ভাইয়ের খবর আছে এতে, এখনই শোনো। যদি জিজ্ঞাসা করে কে দিল এটা, কী বলবি?"
"বলব, একটা বুড়ো মতো লোক দিয়েছে। তাই তো?"
"হ্যাঁ, দিয়ে আর দাঁড়াবি না। দৌড়ে পাশের গলিতে চলে যাবি। মাসিমা ওখানে রিকশা নিয়ে অপেক্ষা করবেন, উঠে পড়বি। যেতে যেতেই পোশাক মানে শার্টটা পালটে নিবি। জুতো পরে নিবি। মুখ পরিষ্কার করে, চুল আঁচড়ে নিবি।"
ভোম্বল পটকার হাত থেকে সিডি'টা নিয়ে উলটে-পালটে দেখে নিল। তারপর ওর ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।
ঠিক যতটা ধীরে সুস্থে ঢুকেছিল ভোম্বল ঘরের ভিতর, একটু পরে ততটাই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এল। প্রথমেই ছুটল নিজের বাড়ি।
"বাবা, বাদলা বাড়ি ফেরেনি?"
"তাতে তোমার কী? তুমি কেন ওর খোঁজে এসেছ?"
"ওর খুব বিপদ হতে পারে বাবা।"
"তোমার ভাই হয়েই তো ওর সবচেয়ে বড় বিপদ হয়েছে।"
ভোম্বল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মোবাইল ফোনটা হাতে নিল, সঙ্গে-সঙ্গে সেটা বেজে উঠল, "কাউকে ফোন করার চেষ্টা কোরো না ভোম্বল। করলেও পাবে না, বাদলের বিপদ বাড়বে। থানায় যাও। তোমাকে যা বলা হয়েছে তাই করো। ওই অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেবে।"
ভোম্বল পকেটে রাখল ফোনটা। ছুটল থানায়। বোধহয় ভাবছিল, সুদীপদাকে গিয়ে বললেই সব সমাধান হয়ে যাবে। শুভনীল কাল রাতে কিশোরের ফোন পেয়েছে। কিশোর বলেছিল, কাল বিকেল থেকেই থানায় উপস্থিত থেকো। শুভনীল বলেছিল, নতুন ওসি'র সঙ্গে তো কথা বলে এসেছি, কাল আবার যাব? কেন? কিশোর আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেছিল, গেলেই দেখতে পাবে। তোমার ওখানে কাল থাকা দরকার।
ঝড়ের মতো এসে থানায় ঢুকল ভোম্বল। ওসি'র সিটে নতুন অফিসারকে দেখে চমকে গেল। পাশেই অন্য একটা চেয়ারে বসে আছে শুভনীল। ভোম্বল তাকে বলল, "আপনার সঙ্গে যা হয়েছে, সেটা আমার ব্যাপার। এর মধ্যে আমার ভাইকে টানলেন কেন?"
"এটা তোমার ভুল ধারণা ভোম্বল, তোমার ভাইকে আমি চিনিই না।"
আবার ফোন বাজল ভোম্বলের। এবার ও সত্যিই অবাক হয়ে গেল। এতক্ষণ

ভাবছিল, ওই অফিসারই নিশ্চয় বাদলকে ধরে নিয়ে গিয়ে ওকে চাপ দিচ্ছে। কিন্তু সে তো এখানে বসে আছে! ভোম্বল ফোন কানে নিল, শুনতে পেল, ''তুমি অযথা দেরি করছ, ভাইকে ভালবাস তো?''
''ওর সঙ্গে একবার কথা বলতে পারি?''
''শোনো তাহলে।''
ভোম্বল শুধু বাদলের একটা ফোঁপানি-দাদা-দাদা— আর চিৎকারটা শুনল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওসি'কে বলল, ''আমি একটা মুচলেকা দিতে চাই।'' ভোম্বল গড়গড় করে বলে গেল, ''সেদিন বাজারে আমিই তোলা তুলছিলাম, মারপিটও আমি করছিলাম। এই শুভনীল দাশ পুলিশ অফিসার, সম্পূর্ণ নির্দোষ। সেদিন যে দু'জন সাক্ষী দিয়েছিল, তারা আমারই বন্ধু। মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছিল। থানার লক-আপে আমাকে একেবারেই মারা হয়নি। অফিসারকে ফাঁসাতেই মিথ্যে বলেছিলাম। আমি নিজে দোষ স্বীকার করছি।''
ওর বক্তব্যটা লিখে নিয়েছিল একজন। এবার ওর হাতে পেনটা দিতেই ও সই করে দিল।
সঙ্গে সঙ্গে ওসি বলল, ''অ্যারেস্ট হিম।''
''ঠিক আছে অ্যারেস্ট করুন কিন্তু আমি একটা ফোন করতে চাই, এই মাত্র যে নম্বরটা থেকে কল এসেছিল, সেই নম্বরে। একবার মাত্র।''
শুভনীল ওসি'কে রিকোয়েস্ট করল, ভোম্বলকে অনুমতি দিলেন তিনি। ভোম্বল বার-বার নম্বর টিপতে লাগল, প্রতিবারই 'দিস নম্বর ডাজ় নট এগজ়িস্ট' হল। রাগ করে ছুড়ে ফেলল ফোনটা ভোম্বল। একজন কনস্টেবল এসে সেটা তুলে নিল। আসলে কিশোর এতক্ষণ যে ফোনে ভোম্বলের সঙ্গে কথা বলছিল সেই সিম কার্ডটা বের করে ভেঙে জলে ফেলে দিয়েছে।
লক আপে ঢুকে উদ্বেগে ছটফট করছিল ভোম্বল। ও জানে না ঠিক করল না ভুল করল। জানে না কপালে কী আছে এবার। প্রচুর মারবে ওকে শুভনীল অফিসার। বাদলাটার কী হবে কে জানে?
শুভনীলের ফোন এল। কিশোরের ফোন। ও উঠে বাইরে গিয়ে ফোনটা ধরল, চাপা গলায় বলল, ''এই মিরাকলটা কী করে ঘটালি বল তো?''
''কেন, প্রথম সুতোটা তুমিই ধরিয়ে দিলে, ওই যে ভোম্বলের একমাত্র দুর্বলতা ওর ভাই। তারপর আর কী, শুধু সুতো বুনে চলা। শোনো, তোমরা কিন্তু ভোম্বলকে একদম মারবে না। যে ভাইকে অত ভালবাসে তাকে মারধোর করা আমাদের দলের পছন্দ নয়। তাছাড়া ভোম্বল জাস্ট একটা উঠতি মস্তান। ওর এগেনস্টে খুন বা বড় রকমের কোনও অ্যালিগেশন নেই। বাজারে তোলা নিয়েই বোধহয় কেরিয়ার শুরু করেছিল।''
''তোরা কিন্তু ওর ভাইয়ের কোনও ক্ষতি করবি না। ওটা আনএথিক্যাল।''
হো-হো করে হেসে উঠল কিশোর, ''আমাদের কাজের ধারাটা আলাদা শুভদা। তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।''
''তোদের গ্রুপের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে প্লিজ়।''
''এখন না। আমরা মেঘের আড়ালে থেকে যুদ্ধ করতে ভালবাসি। যদি কখনও আমাদের প্রয়োজন হয়, সেই দিন পাশে থেকো। তাহলেই হবে। তুমি আবার নিজের জায়গায় ফিরে আসছ তো?''
''হ্যাঁ, কথা হয়ে গেছে। থ্যাঙ্কস কিশোর। তোদের বাহিনীর জন্য শুভেচ্ছা রইল।''
''কিসের থ্যাঙ্কস? তোমাকে গুরুদক্ষিণা দিলাম। একসময় তুমি আমার আইডল ছিলে। আর হ্যাঁ, যদি ভোম্বলের সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসে, তোমাদের সামনেই যেন কথা বলে। আড়ালে কথা বলতে দিও না।''
''হ্যাঁ-হ্যাঁ, দু'টো ছেলে এসেছিল। ওর ভাইয়ের খবর নিতে বলল। তারা বোধহয় বাইরে গিয়ে কোনও ফোনে কথা বলল তারপর ভোম্বলকে জানিয়ে গেল, তার ভাই এখনও বাড়ি আসেনি। এই কথা শোনার পর মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে ভোম্বল।''
''শুভদা, ভোম্বলকে একটা সুযোগ দেওয়া যায় না? আমাদের দল বলছে, ওকে দিয়ে একটা কিছু লিখিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় কি? ও যদি আর কখনও তোলা তুলতে যাবে না বলে কথা দেয়! তুমি পরে একদিন বাজারে গিয়ে ঘুরে এলে, সবাই ভাববে, তুমি এটা বন্ধ করলে। হিরো হয়ে যাবে তুমি।''
''কিশোর, আমি কী-কী করব, সেটাও কি তোরা ঠিক করে দিবি?''
''সরি-সরি। এর পর থেকে সব কিছু তোমার উপরে। রাখছি শুভদা। বাই।''
কিশোর ফোন ছেড়ে দিল।
শর্বরী ওকে ইঙ্গিতে কিছু বলল, কিশোর ফোন থেকে এই সিম কার্ডটাও বের করে ভেঙে ফেলে দিল। শুভনীল দাশ আর চট করে কিশোরকে খুঁজে বের করতে পারবে না।

ভোম্বল যখন কিশোর আর শর্বরীর হাতে পুতুলের মতো নাচছে, তখন ছুটছে থানায়। ঘটে যাচ্ছে নানা ঘটনা। ঠিক সেই সময়ে বাদলকে নিয়ে এসেছে স্কুল থেকে রাগিণী। ওকে বসিয়ে রেখেছে অনেকক্ষণ, বলেছে আজই রেজ়াল্ট বেরোবে। বাদলকে রাগিণী দামি পেস্ট্রি খাওয়ালো, শরবত এনে দিল। ওকে যতখানি সম্ভব যত্ন করল। বসিয়ে রাখল আশা দিয়ে।
তারপর ওদিক থেকে শর্বরী যখন ফোনে সিগনাল দিল তখন রাগিণী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বাদলের পাশে বসল, ''বাদল, তোমার গলার আওয়াজ, ফটো ফেস সবই খুব ভাল। অভিনয়ও জানো।''
''তাহলে আমি সিলেকটেড দিদি?''
বাদলের উৎসাহে জল ঢালতে একটু মায়া লাগছিল রাগিণীর, শুকনো মুখে বলল, ''না বাদল, তুমি অন্য একটা ব্যাপারে আটকেছ। কিছু মনে কোরো না, তোমার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডে কিছু আপত্তিজনক ব্যাপার আছে।''
বাদল চুপ করে রইল।
''তুমি হয়তো ভাবছ, এটা কেন আসছে? কিন্তু আমাদের এখানে অল্পবয়সি শিল্পীদের ক্ষেত্রে ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডের একটা ভূমিকা আছে। তোমার দাদার সুনাম নেই পাড়ায়! সে বাড়িতেই থাকে না। বোধহয় তোমার বাবা তাকে ত্যাগ করেছে।
সত্যি?''
''সত্যি।'' বাদল অস্বীকার করল না।
''মন খারাপ কোরো না। পরের বার তুমি বড় হয়ে যাবে। নিজেই নিজের পরিচয় বহন করবে। সেদিন আর দাদার জন্য কেরিয়ার নষ্ট হবে না তোমার। আমিও তোমার জন্য চেষ্টা করব বিশেষভাবে। প্রমিস।''
বাদল ভীষণ মন খারাপ করে বাড়ি ফিরে এসেছে। খুব রাগ হচ্ছে দাদার উপর। আবার বলে, বাদলা তুই আমার চোখের মণি! রাগে জ্বলতে লাগল ও। একটু রাতের দিকে মনা আর বিট্টু এল, ''বাদল-বাদল।''
ওদের দেখে বাদল চটে গেল খুব, ''তোমরা চলে যাও। কক্ষনও আসবে না।''
''যারা তোকে নিয়ে গিয়েছিল, তারা বুঝি খুব খারাপ ব্যবহার করেছে? জানিস, তোর দাদা কী করেছে তোর জন্য?''
''আমি কিছু শুনতে চাই না দাদার কথা। যাও চলে যাও।''
মনা আর বিট্টু কী বুঝল কে জানে? ঘাড় হেঁট করে চলে গেল।

১৮

রাগিণীর বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। দল আর এখন কোনও অ্যাসাইনমেন্ট নেবে না ঠিক করেছে।

এখন শুধু আনন্দ। নো টেনশন। নো ঝুট ঝামেলা।
প্রথমে রাগিণী বলেছিল, কোর্ট ম্যারেজ করবে। এই বয়সে বেনারসি-টোপর, কেমন লজ্জা-লজ্জা করছে।
হিমাদ্রিবাবু রাজি নন। তাঁর একমাত্র মেয়ে। তারপর আবার সে মাতৃহারা। সমাজ কী বলবে? হিমাদ্রিবাবু দায়সারা কাজ করলেন?
"ওভাবে বলছ কেন বাবা?" রাগিণী অবাক হয়ে বলল, "সমাজ কী কাজে লাগবে?"
"হ্যাঁ, মেয়ের বাবা কন্যা সম্প্রদান করেন, সব অর্থও খরচ করেন, তবু একা তো মেয়ের বিয়ে দেওয়া যায় না। দিতেও নেই। সবাইকে নিয়ে দিতে হয়। সেটাই সম্মানের।" সব তর্কের অবসান ঘটিয়ে রাগিণীর সনাতনি প্রথাতেই বিয়ে হল। রেজিস্ট্রিও হল।
আর এই সবের পুরোভাগে থাকল ঝটিকা বাহিনী। কেউ জানতেও পারল না। মেঘের আড়ালে এরা একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে কী প্রবল অ্যাক্টিভ। না-না করেও প্রচুর লোক সমাগম হল।
সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা, শর্বরী কপিলকে সঙ্গে নিয়েই এল।
হিমাদ্রিবাবু খুব খুশি হলেন, বললেন, "তুমিও আমার এক জামাই, মনে রেখো।" কপিল হাসল। রাগিণীর নাম ও শর্বরীর মুখে শুনেছে কিন্তু কখনও আলাপ হয়নি। শর্বরী যে বিয়েবাড়িতে এসে কোথায় হারিয়ে গেল। কপিলের অস্বস্তি হচ্ছিল। নতুন কনেকে তো ও একা দেখতে যেতে পারে না।
শর্বরী গিয়ে দেখল রাগিণীর কপালভর্তি সিঁদুর। সাজানো গোছানো কনের পোশাক, কপিল চট করে নাও চিনতে পারে। একটু ঝুঁকি নিতেই হবে। ও এসে কপিলকে বলল, "চলো, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুর আলাপ করিয়ে দিই। তবে যা ভিড়। সব মেয়েরা বোধহয় কনের আশে পাশে ভিড় করেছে।"
"না-না, ওই মেয়েদের ভিড়ে আমি যাব না। থাক তাহলে।"
"থাকবে কেন? চলই না, দূর থেকে আলাপ করিয়ে দেব। নমস্কার করে দিও।" মনে-মনে হাসছিল শর্বরী।
"এই রাগিণী, এই দেখ, আমার বর কপিল সেন।"
রাগিণী হাত তুলল, কপিলও। কপিলের চোখ কুঁচকে গেল। কোথায় দেখেছি একে? এত চেনা-চেনা লাগছে!
শর্বরী ওকে টেনে নিয়ে গেল খাওয়ার জায়গায়। বুফের প্লেট ধরিয়ে দিল হাতে। হাসিখুশি সুরে বলল, "খেয়ে নিই, কাল আবার স্কুল আছে।" কপিল চিন্তান্বিত মুখ করে বলল, "হুঁ, চলো।"
বিয়েতে সন্ধ্যামণি, পান্না, পটকা এবং সুহাসিনী এসেছে। মুকুল আসতে পারেনি, কোলে ছোট বাচ্চা। কিশোর তো খুব কাজ-টাজও করছে। কনের পিঁড়িও ধরেছে নাকি সে। কিন্তু ঝটিকা বাহিনী একবারের জন্যও নিজেরা একসঙ্গে হল না। কিশোর যে সুহাসিনীকে চেনে কিংবা সন্ধ্যামণির সঙ্গে শর্বরীর জীবনে কখনও দেখা হয়েছে বলে বোঝা গেল না। মেঘের আড়ালে যারা 'সংঘবদ্ধ', মেঘের বাইরে তারা নিতান্তই নিরীহ একক, ইন্ডিভিজুয়াল। বাড়ি ফেরার পথে কপিল বলল, "শর্বরী, তোমার বন্ধুকে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে।"
"ওই তো, সুন্দরী মেয়ে দেখলেই তোমার তাকে চেনা-চেনা লাগে। দিস ইজ ভেরি ব্যাড কপিল।" শর্বরীর ঠোঁটে হাসিটা চাপা, কিন্তু মুছে ফেলতে পারছে না।
কপিল মাথা নাড়ল, হাসলও, "না-না, সে সব নয়। বিশ্বাস করো। তবু তুমি ওদের একদিন জোড়ে আমাদের বাড়িতে নেমন্তন্ন করবে নিশ্চয়, তখন ভাল করে দেখব।"
শর্বরী মনে-মনে বলল, জোড়ে বা বিজোড়ে, তোমার উপস্থিতিতে ওদের এই বাড়িতে কখনই ডাকব না। আর সেই জন্যই অংশুমানের সঙ্গে তোমার আলাপ করাইনি।

বিয়ের পর রাগিণীর জীবন এমন কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করল যা কখনও আগে ভাবেনি। সব মেয়েই বোধহয় করে। বুদ্ধি করে সব সামলানো চাই। রাগিণী কমললতা আর অংশুমানের মধ্যে কখনই থাকে না। সে যখন ওই মানুষটার সমস্যা বুঝেই গিয়েছে তখন তো আর কোনও প্রবলেম নেই। অংশুকেও বলে দিয়েছে, বউ এসেছে বলে আহ্লাদ করার কিছু নেই, মায়ের সঙ্গে আগের মতো থাকবে। 'রানি' 'রানি' বলে যেন কখনও আদিখ্যেতা করে ফেলো না ওঁর সামনে।
অংশুমান একটু আহত গলায় বলেছে, "রানি, তুমি এরকম মার্শাল ল' জারি করছ কেন? এত দিন পর তুমি আমার ঘরে এলে, তোমাকে নিয়ে একটু মগ্ন হয়ে থাকব না? মা কিছু মনে করবে না, তোমাকে খুব ভালবাসে।"
"মনে-মনে মগ্ন হয়ো। আর মা যাতে আমাকে ভালবাসে, সেই চেষ্টাই করছি।"
"তোমাদের, মানে মেয়েদের মধ্যে কিন্তু বড্ড বেশি জটিলতা, কেন কে জানে?"
অংশুর বেজার মুখ দেখে রাগিণী ভিতরে-ভিতরে তুমুল হাসল, আমরা যত জটিল হব তোমাদের আকর্ষণ তত বাড়বে। সহজ অঙ্কের জন্য কে আর মাথা ঘামায়!
এর মধ্যে বেশ একটা মজা হয়েছে। কিশোর আর মধুরিমার ব্যাপারটা বাহিনী জেনে গেছে।
শর্বরী বলল, "এই কেসটা আমরা নিতে পারি না রাগিণী? মধুরিমার সঙ্গে কিশোরের গাঁটছড়া বেঁধে দেওয়াটাই হোক আমাদের নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট।"
কিশোর হাঁ-হাঁ করে উঠেছে, "মোটেই নয়। ওটা আমাকে একাই সামলাতে দাও। মধুরিমা কোনও কেস নয়, শি ইজ মাই ড্রিম।"
"ওঃ, ভাবা যাচ্ছে না। তবে দেখিস কিশোর, স্বপ্ন যত সুন্দরই হোক, এক সময় সেটা ভেঙে যাবেই।" রাগিণীর সাবধানবাণী বাকিরা সমর্থন করল।
কিন্তু কিশোর মাথা নাড়ল, "স্বপ্ন যে কখনও-কখনও সত্যিও হয়, আমি দেখাব।" সকলেই সেই আশায় থাকল।
এর মধ্যে কোনও বড় কাজ আর বাহিনীর হাতে আসেনি। মেঘের আড়ালে ওরা বিশ্রাম নিচ্ছে। জাস্ট লেঞ্জার-টাইম, আর কী?

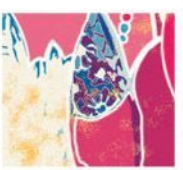

হিমাদ্রিবাবু রাজি নন।
তাঁর একমাত্র মেয়ে।
তারপর আবার মাতৃহারা।
সমাজ কী বলবে?

সত্যি করে বলতে কী বিয়ের পর রাগিণীর বাহ্যিক জীবনে তেমন কোনও পরিবর্তনই আসেনি। সে দিব্যি ছিল। ঘর-বর এবং বাইরের ঝড় ভালই সামলাচ্ছিল। গন্ডগোলটা বাঁধল তখন, যখন অংশুমান দুম করে এই চাকরিটা ছেড়ে দিয়ে অন্য একটা চাকরিতে জয়েন করে বসল, আর তারা ওকে পোস্টিং দিয়ে দিল শোলাপুরে, মুম্বই থেকে যেতে হয়।

রাগিণী মাথায় হাত দিয়ে বসল। অংশু বলেছে, ওখান থেকে আবার কবে কলকাতা আসতে পারবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তাই মা এবং বউকে নিয়েই চলে যাবে।

রাগিণী প্রথমে আপত্তি করেছিল কিন্তু হিমাদ্রিবাবু, কমললতা এবং অংশুমান এক দলে চলে যাওয়াতে তার আপত্তি টিকল না। রাগিণীর খুব মন খারাপ।

কলকাতা ছাড়তে হচ্ছে বলে তত না, চাকরি ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলেও না। কারণ ওখানে নিশ্চয়ই একটা চাকরি পেয়ে যাবে। ওর আসল মন খারাপ ঝটিকা বাহিনী ছেড়ে যেতে হবে বলে। ওর বিয়ের পরও দু'চারটে কেস সলভড করেছে ওরা। কোনও অসুবিধা হয়নি।

'মেঘের আড়ালে ঝড়ের যুদ্ধ করে আমরা মশাল হয়তো জ্বালতে পারিনি কিন্তু যে মোমবাতিটা আমরা জ্বালিয়েছিলাম, সেটা নিভিয়ে ফেলার কোনও অধিকার আমার নেই। যেটুকুই হোক, একটু আলো তো জ্বলেছিল। সেই ঝড় থেমে যাবে?"

শর্বরী বলল, "অত মন খারাপ করিস না। মোমবাতি জ্বলবে, আমি কথা দিচ্ছি। সেরকম দরকার পড়লে, তোকে ডেকে পাঠাব। তুই চলে আসবি।"

"শোলাপুর কী শিয়ালদহ? যে ইচ্ছে হলে চলে আসব। মুম্বই থেকে কতটা যেতে হয়! কীরকম পরিস্থিতি হবে কে জানে?"

"শিয়ালদহ না হলেও সাইবেরিয়া তো নয় রে বাবা! ঠিক আসতে পারবি।"

"তুই আর আমিই ছিলাম বাহিনীর মেন পিলার। হঠাৎ এরকম করে চলে যাওয়াতে নিজেকেই ট্রেচারাস লাগছে। আমি দলের সঙ্গে অন্যায় করছি।"

"আমার উপর তোর বিশ্বাস আছে? না, নেই? কিশোর, সন্ধ্যা, এরাও খুব অ্যাক্টিভ। ভাবিস না। ফোন আছে, মেল আছে। চিন্তা কি?"

"বেশ, তোর হাতেই মোমবাতির শিখাটি বাঁচিয়ে রাখার ভার দিয়ে গেলাম।" মন খুঁতখুঁত করতে-করতে রাগিণী রওয়ানা দিল।

কিশোর, সন্ধ্যা, সুহাসিনী সবাই ওকে আশ্বস্ত করল কিন্তু কেউই চোখের জল গোপন করতে পারল না।

রাগিণী চলে যাওয়াতে সবাই ভেবেছিল বাহিনীর একটা ডানা কাটা গেল কিন্তু সেটা মুখে কেউ প্রকাশ করেনি।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, রাগিণী ওখান থেকে এখানকার সব খবরই পেত। বেশির ভাগই ফোনে। মেল খুব কম চালাচালি করে ওরা। আর প্ল্যান করেই ফেসবুক রাখেনি কেউ। ফেসবুক মানেই পরিচিতি। সব কিছুই ওপেন টু অল। হাটুরে জীবন যাকে বলে। কোনও ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু নেই। কোনও গোপনীয়তা নেই। ওরা সেটা চায় না। ওরা আড়ালই চায়।

একবার শর্বরী খবর দিল, 'কে বা কারা কিশোরকে খুব মেরেছে। ও হসপিটালাইজড।' ফোনের মধ্যেই রাগিণী আঁতকে উঠেছিল, 'সে কী! কে করল এটা?"

"আমার মনে হয়, ভোম্বলের কাজ। কিশোরকে খুঁজে পেয়েছে যে করেই হোক।"

"কিশোর শুভনীলের সাহায্য নিতে পারে তো এখন!"

"বলেছিলাম, নেবে না। মধুরিমা হাসপাতালে ওকে রোজ দেখতে এসেছে, তাতেই ওর সব কষ্ট ধুয়ে গেছে।"

সন্ধ্যা একদিন জানাল, "পান্না বলেছে, সে ছেলে হয়ে যাওয়ার চিন্তা ছেড়ে দিয়েছে। তুমি যে বলেছিলে, আত্মবিলোপের পথে না গিয়ে আত্মরক্ষা করতে শেখো, সেটা ওর মনে খুব ধরেছে। পান্না ক্যারাটে ক্লাসে ভর্তি হয়েছে।"

"তুমি কেমন আছ সন্ধ্যা?"

"সত্যি বলতে কী দিদি, আমি ভাল নেই। রাগের মাথায় শাস্তিটা দিয়েছিলাম, সে যেন এখন জগদ্দল পাথরের মতো গলায় ঝুলছে। ফেলতেও পারব না, বইতেও বড় কষ্ট। তবে আক্ষেপ করি না। চালিয়ে নেব ঠিক।"

সুহাসিনী মাসিমার শরীর ভাল নেই। একদিন ফোনে বললেন, "এত দিন কখনও ভাবিনি বুড়ো হয়েছি। প্রচণ্ড মনের জোর পেয়েছি তোমাদের কাছে। নতুন করে বেঁচে উঠেছিলাম।

কিন্তু শরীরের কলকবজা বিশ্বাসঘাতকতা করতে শুরু করেছে।"

রাগিণী হাজার মাইল দূরে বসে কলকাতার দলের উত্তাপ অনুভব করতে চাইত। মন পড়ে থাকত এখানে।

একদিন হঠাৎ রাগিণী একটা মেল পেল। একটা অদ্ভুত মেল।

শর্বরী সেই মেল-এ লিখেছে— "যাওয়ার সময় তুই আমার হাতে যে মোমবাতির দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলি, সেই দায়িত্ব আজ আমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছি। আমাকে ক্ষমা করিস। পরে তোরা হয়তো আবার দল গঠন করবি, এরা সকলেই রইল, এবার শুভনীলকে হয়তো পাশে পাবি। মোমবাতি সেদিন সত্যিই মশালে পরিণত হবে। কিন্তু আমাকে সেদিন পাবি না। কপিল আমার কাছে ধরা পড়ে গিয়েছে। আসলে কোনও দিনই ওর সংশোধন হয়নি। এটার বিহিত আমাকে একাই করতে হবে। বিশেষ করে যে মায়ের নামে শপথ করে মিথ্যাচার করে, তার সঙ্গে এক ছাদের নীচে আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়।

তোদের হয়তো মনে আছে, আমি একটা কথা বার-বার বলতাম— যতই কাজ করি আমরা, কখনও কোনও ক্রাইম করব না। আজ আমিই একটা বড় ক্রাইম করতে যাচ্ছি। তাই দল থেকে আমার ছুটি। এই মেল পেয়ে তোর কলকাতায় ছুটে এসে লাভ নেই, তোদের আমি চিনি না।"

রাগিণী মেলটা কয়েকবার পড়ল। তারপর শর্বরীকে ফোনে পেতে চেষ্টা করল। বার-বার। পেল না। শুধু পেল— চেক দ্য নাম্বার ইউ হ্যাভ ডায়ালড। চেক তো করতেই হবে। তবে এখানে বসে হবে না।

রাগিণী নেট খুলল, কলকাতার ফ্লাইট মুম্বই থেকে কাল কখন আছে? কিন্তু ওর মন বলছিল, গিয়েও কিছু করতে পারবে তো? দেরি হয়ে যাবে না তো?

রাগিণী অনুভব করতে লাগল, মেঘের আড়ালে মোমবাতিটার আলো ধীরে-ধীরে ক্ষয়ে আসছে। আসুক, ও ভয় পাবে না। মেঘের আড়ালে বজ্র বানাতে হবে। আবার তুলতে হবে তীব্র ঝড়। তার আগে বাঁচাতে হবে শর্বরীকে। ওদের নেক্সট অ্যাসাইনমেন্ট।

অলংকরণ: শৌভিক রায়